খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসসি
ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা,সিএসসি
ফাদার অসীম টি. গনসালভেস, সিএসসি
রবার্ট টমাস কস্তা

সম্পাদনা

ফাদার আদম এস পেরেরা, সিএসসি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত জীবনাহ্বান ও ঈশ্বর কর্তৃক আহূত ব্যক্তিদের আনুগত্য ও জীবনচরিত্র সন্নিবেশ করে পরিমার্জিত কারিকুলামের আলোকে রচনা করা হয়েছে। পরিত্রাতা যীশুর জীবন ও কাজগুলো জানা ও তাঁর পরিত্রাণে বিশ্বাসী হয়ে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা, উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনায় উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে অত্র পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র যীশু খ্রিস্ট	১–৮
দ্বিতীয়	ঈশ্বরের সৃষ্টি উত্তম	৯–১৫
তৃতীয়	দেহ, মন ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ	১৬–২৫
চতুর্থ	পাপ	২৬–৩৪
পঞ্চম	মুক্তিদাতা যীশুর জীবন ও কাজ	৩৫–৪২
ষষ্ঠ	ঈশ্বরের আহ্বানে মারীয়ার সাড়াদান	৪৩– ৫১
সপ্তম	যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য	৫২–৫৯
অষ্টম	খ্রিস্টমণ্ডলী এক, পবিত্র ও প্রৈরিতিক	৬০–৬৭
নবম	ক্ষমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম	৬৮–৭৮
দশম	ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং	৭৯–৮৮

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র যীশু খ্রিষ্ট

পিতা ঈশ্বর জগতকে এতই ভালোবেসেছেন যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন। পিতার ইচ্ছা হলো পুত্র ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করা। যীশুই হলেন পিতার অভিষিক্ত জন, মুক্তিদাতা খ্রিষ্ট এবং সকল জাতির সকল মানুষের প্রভু। তাঁর মধ্য দিয়ে মানবজাতি পরিত্রাণ লাভ করেছে এবং পেয়েছে শাশ্বত জীবনের প্রতিশ্রুতি। তিনি প্রকৃত ঈশ্বর আবার প্রকৃত মানব। আমরা তাঁরই সম্পর্কে এই অধ্যায়ে জানতে চেষ্টা করব।

ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিষ্ট

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের কথা বর্ণনা করতে পারব।
- ঈশ্বরের পুত্র 'যীশু' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঈশ্বরপুত্রের উপাধি 'খ্রিষ্ট'– এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঈশ্বরপুত্রের উপাধি 'প্রভু'-র অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঈশ্বরপুত্র প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানব, তা বর্ণনা করতে পারব।
- যীশুকে নিজের প্রভু বলে গ্রহণ করব ও প্রভুর পথে চলতে অনুপ্রাণিত হবো।

পাঠ ১: ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র যীশু খ্রিস্ট

পূর্বের শ্রেণিতে আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে জেনেছি। জগৎ সৃষ্টি ও মানবজাতির কল্যাণে তাঁর কর্মকীর্তি আমরা বিভিন্নভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবজাতির জন্য তাঁর মুক্তিপরিকল্পনার কথাও আমরা অবগত হয়েছি। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁকে জানতে পারি, তাঁর প্রতি অনুগত থাকি, তাঁকে ভালোবাসি ও তাঁর গুণকীর্তন করি। তিনিই প্রথম আমাদের ভালোবেসেছেন যেন আমরা তাঁকে ভালোবাসতে পারি।

ঈশ্বরকে জানতে গিয়ে আমরা আরও দেখেছি যে, তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন: কখনো পিতারূপে, কখনো পুত্ররূপে, আবার কখনো পবিত্র আত্মারূপে। তিনি একসাথে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেননি। তাঁকে পরিপূর্ণভাবে বোঝার যোগ্যতা মানবজাতির নেই। তাঁর মহানুভবতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে তিনি আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দয়াশীল ঈশ্বর তাঁর এই প্রতিশ্রুতির কথা কখনো ভুলে যাননি। তিনি আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। সময় হলে পর তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করলেন।

মানবজাতি বারে বারে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে। ভাই ভাইকে খুন করে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে। এভাবে তাদের পতন হয়েছে। মহান ঈশ্বর মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে এবং তাঁর কাছে মানুষকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে একটি মহাপরিকল্পনা করেছেন। তিনি এই পরিকল্পনা করেছেন যে, তিনি মানুষের কাছে আসবেন। তাই ঠিক করেছেন তাঁর একমাত্র পুত্রকে একটি নারীর মধ্য দিয়ে জগতে প্রেরণ করবেন।

রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট অগাস্টাস সিজারের সময়ে এবং যুদেয়া দেশের রাজা হেরোদের শাসনামলে বেথলেহেমের একটি কুমারীর কাছে তিনি তাঁর দূতকে প্রেরণ করলেন। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারীয়ার কাছে এসে ঈশ্বরের বার্তা প্রকাশ করলেন। মারীয়াকে প্রসাদে পূর্ণা বলে তিনি অবহিত করলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি মারীয়াকে জানালেন যে, ঈশ্বর তাঁর সহায় আছেন। তিনি গর্ভবতী হবেন এবং একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেবেন। তাঁর নাম হবে যীশু। তিনিই হবেন সমগ্র মানবজাতির মুক্তিদাতা।

মারীয়া একজন সহজ সরল যুবতী ছিলেন। তাঁর বাবার নাম যোয়াকিম এবং মায়ের নাম আন্না। তিনি যোসেফ নামে এক যুবকের সাথে বাগদত্তা হয়েছিলেন। প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সাথে মারীয়ার পরিবার ছোট একটি গ্রামে বাস করতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের জীবনযাপন চলছিল। মারীয়ার পিতামাতা ধার্মিক এবং ঈশ্বরের অনুগত ছিলেন। পিতামাতার স্নেহভালোবাসায় ও যত্নে মারীয়া বড় হন। পিতামাতার ন্যায় মারীয়াও খুব ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। ঈশ্বর আগে থেকেই মারীয়াকে মনোনীত করে রেখেছিলেন তাঁর পুত্রের জননী হওয়ার জন্য। তাই তিনি মারীয়াকে জন্মের আগে থেকেই আলাদা করে রেখেছিলেন, যেন আদিপাপ তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে। মারীয়া ছিলেন নিষ্কলঙ্কা ও আদিপাপ বর্জিতা। গাব্রিয়েল দূতের সম্বোধনে মারীয়া বিচলিত হলেন। দূতের বার্তা অসম্ভব ভেবে তিনি দূতকে প্রশ্ন করলেন, এ কী করে সম্ভব, কারণ তিনি যে কুমারী। দূত বললেন, ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। কাজেই পবিত্র আত্মার প্রভাবে মারীয়া গর্ভবতী হবেন। কারণ যাঁর জন্ম হবে তিনি ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবেন। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে মারীয়া "হ্যাঁ" বলেছেন। আর এই "হ্যাঁ" বলার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

মারীয়ার স্বামী যোসেফ একজন ধার্মিক, ঈশ্বরভীরু ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি। তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেই মারীয়া গর্ভবতী হলেন। এই সংবাদ জানার পর তিনি তাঁকে

গোপনে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর গাব্রিয়েল দূতকে যোসেফের কাছে প্রেরণ করলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা তাঁকে জানালেন। যোসেফকে তিনি সাহস দিলেন যেন মারীয়াকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে ভয় না পান। কারণ মারীয়া পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভবতী হয়েছেন। আর তাঁর যে সন্তান হবে তা ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে। গাব্রিয়েল দূতের কথামতো যোসেফ সবকিছু করলেন। তিনি মারীয়াকে নিজের স্ত্রী ও যীশুকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করলেন। এভাবে মারীয়া ও যোসেফের পরিবারে ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করলেন। তিনি শাশ্বত ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র, প্রভু যীশু খ্রিষ্ট। “আপনি সেই খ্রিস্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র” (মথি ১৬:১৬)–সাধু পিতরের মতো করে এই কথা বলে আমরা সবাই যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি। কারণ তাঁর আগমনে সমগ্র মানবজাতি পেয়েছে অনুগ্রহ আর পরিত্রাণ।

কাজ : মারীয়ার যে কোন ৩টি গুণ লেখ।

পাঠ ২: ‘যীশু’ নামের অর্থ

আমাদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক নাম আছে। প্রতিটি নাম খুব সুন্দর। আমরা এই নামেই অন্যের কাছে পরিচিত। সাধারণত বাপ্তিস্ম বা নামকরণ অনুষ্ঠানের সময় আমাদের নামকরণ করা হয়। একেক জনের নামে আমরা অনেক আক্ষরিক অর্থ কিংবা সমার্থক শব্দ খুঁজে পাই। আবার অনেক নামের কিছু ঐতিহাসিক কিংবা অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে। এসব নামের ব্যাখ্যা করলে অনেক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়।

পবিত্র বাইবেলে এমন অনেক নাম আছে যেগুলোর সাথে কোনো ঘটনা বা ঈশ্বরের কোনো বিশেষ পরিকল্পনার সাথে মিল পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ , ‘মোশী’ নামের অর্থ হলো জল থেকে টেনে তোলা। এই নাম ও এর অর্থ শুনলে সাথে সাথে আমাদের পবিত্র বাইবেলের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল জাতি মিশরে ফারাও রাজার অধীনে দাসত্ব করেছিল। ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশররাজ ভয় পেয়েছিলেন। তাই রাজার আদেশে ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত পুরুষ-সন্তানদের হত্যা করা হতো। মোশী ইস্রায়েল-সন্তান ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন যেন সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করতে না পারে। পরে ফারাও-কন্যা নদীতে স্নান করতে গিয়ে নদীর নলখাগড়ার আড়ালে একটি শিশুর কান্না শুনতে পান। শিশুটি অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁকে তিনি জল থেকে তুলে এনে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আর নাম দিয়েছিলেন মোশী। কারণ তাঁকে জল থেকে তুলে আনা হয়েছিল। এই মোশীই পরে তাঁর জাতিকে ফারাও রাজার দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। যাকে জল থেকে টেনে তোলা হয়েছিল তিনি তাঁর জাতিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

মোশীর দ্বারা ফারাও/ফৌরাণ রাজার দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও ঈশ্বরের মনোনীত জাতি পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ঈশ্বর বিভিন্ন রাজা, বিচারক, যাজক, প্রবীণ ও প্রবক্তাদের দ্বারা তাঁর মনোনীত জাতিকে গঠন ও পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। অকৃতজ্ঞ মানুষেরা ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিল। তারা বারংবার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল। সমগ্র মানবজাতিকে পাপের কালিমা থেকে উদ্ধার করতে ঈশ্বর তাই নিজেই এসেছেন মানুষের সাথে বাস করতে, মানুষকে পথ দেখাতে ও স্বর্গের পথে নিয়ে যেতে।

মারীয়ার গর্ভে তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে প্রেরণের সময় ঈশ্বর একটি নাম দিয়েছিলেন। গাব্রিয়েল দূত মারীয়াকে বলেছিলেন, এই যে সন্তান, এঁর নাম হবে ‘যীশু’। এই নামের অর্থ হলো ‘ঈশ্বর উদ্ধার করেন’। এই নামেই ঈশ্বর নিজেকে উদ্ধারকর্তা হিসেবে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনিই ক্ষমাশীল ঈশ্বর, যিনি

২০২০

মানুষকে উদ্ধার করতে এ জগতে নেমে এসেছেন। পুত্রের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতি মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। এই নামে ঈশ্বরপুত্র পরিচিত হয়েছেন। এই নাম সকল নামের শ্রেষ্ঠ নাম। কারণ এই নামেই মানবজাতি পরিত্রাণ পেয়েছে। এই নামেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী,বাক প্রতিবন্ধী, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত অনেকেই সুস্থ হয়েছে। এই নামেই অপদূত ভয়ে পালিয়েছে। এই নামেই মৃত জীবন পেয়েছে। আর এই নামের শক্তিতেই শিষ্যগণ যীশুর বাণী প্রচার করেছেন।

পাঠ ৩: খ্রিস্ট নামের অর্থ

যীশুর ভাষা ছিল হিব্রু ও আরামায়িক। পবিত্র বাইবেল লেখা হয়েছে হিব্রু ও গ্রিক ভাষায়। পরে তা লাতিন, ইংরেজি ও অন্যান্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তাই বাইবেলে উল্লিখিত কিছু কিছু নাম বা শব্দ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। সঠিক অর্থ খোঁজার জন্য এর উৎপত্তি আমাদের জানা প্রয়োজন।

'খ্রিস্ট' একটি গ্রিক শব্দ। হিব্রু শব্দ 'মশীহ' থেকে এই শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে। মশীহ শব্দের অর্থ হলো "অভিষিক্ত"। তাই মশীহ বা খ্রিস্ট শব্দের অর্থ হলো অভিষিক্ত। খ্রিস্ট শব্দটি যীশুর নামের সাথে যুক্ত হয়েছে। কারণ তিনি পিতা কর্তৃক প্রেরিত ও অভিষিক্ত। তিনি খ্রিস্ট হিসেবেই পরিচিত হয়েছেন। পিতার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা তিনি পরিপূর্ণ করেছেন।

আমরা জানি যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী, সমাজ বা জাতির মধ্যে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরজন্য প্রথমে তাকে বেছে নেওয়া হয় ও মনোনীত করা হয়। কখনো কখনো কিছু সামাজিক আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তাকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎসর্গ করা হয়।

ইস্রায়েল জাতির মধ্যেও এমন কিছু সামাজিক প্রথা ছিল। ইস্রায়েলীয়দের রাজা, যাজক বা প্রবক্তাদের এভাবে বেছে নেওয়া হতো। বিশেষভাবে ঈশ্বরের কাজের জন্য যারা উৎসর্গীকৃত তাদেরকে অভিষিক্ত করা হতো। পবিত্র বাইবেলে এরূপ অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করাই ছিল যীশুর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি একাধারে রাজা, যাজক এবং প্রবক্তা ছিলেন। তিনি অন্যান্য রাজাদের মতো নন। তাঁর রাজত্ব শাশ্বত ও চিরকালের।

যীশুর জন্মের পর স্বর্গদূতেরা রাখালদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন "আজ দাউদ/দায়ুদ নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন, তিনি খ্রিস্ট প্রভু।" জন্মের আগে থেকেই পিতা যীশুকে বাছাই ও মনোনীত করেছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও পবিত্র আত্মার প্রভাবে।

পিতা তাঁকে পবিত্র করেই এ জগতে প্রেরণ করেছেন। বাপ্তিস্মের সময় প্রকাশ্যে পিতা ঈশ্বর মানুষের সামনে যীশুকে অভিষিক্ত করেছেন আর প্রকাশ করেছেন, "তুমিই আমার একমাত্র পুত্র, তোমার ওপর আমি সন্তুষ্ট"। এরই ফলে ঈশ্বরপুত্র উৎসর্গীকৃত, পবিত্র ও মশীহ বা খ্রিস্ট বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আর ক্রুশে উৎসর্গীকৃত হয়ে তিনি পিতার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করেছেন।

পাঠ ৪: খ্রিস্টই প্রভু

প্রভু ঈশ্বর সবকিছুর অধিপতি। তিনি সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর, এমনকি মৃত্যুর ওপরও তাঁর আধিপত্য আছে। "প্রভু" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকে বোঝানো হয়। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর মোশীর কাছে নিজেকে "প্রভু" বলে পরিচয় দিয়েছেন। সেই থেকে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরকে প্রভু বলে সম্বোধন করত। প্রভু বলতে তাঁর সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বোঝায়।

নতুন নিয়মে যীশুকে প্রভু বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি মানুষকে পাপের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। নতুন নিয়মে যীশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ তিনি স্বর্গের এবং মর্ত্যেরও প্রভু।

যীশু খ্রিষ্টই প্রভু। প্রচারকাজের বিভিন্ন সময় যীশু শিষ্যদের কাছে নিজেও এ কথা প্রকাশ করেছেন। অন্ধকে দৃষ্টি দান, খঞ্জকে চলার শক্তি, বোবাকে কথা বলার ক্ষমতা, অসুস্থকে সুস্থ করে তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে প্রকাশ করেছেন। পাপীকে ক্ষমা করে এবং মৃতকে জীবন দিয়ে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ করেছেন।

যীশুর প্রকাশ্য প্রচার জীবনে অনেকে নিরাময় লাভ করে তাঁকে প্রভু বলে সম্বোধন করেছে। যীশুকে প্রভু বলার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। যীশুর পুনরুত্থানের পর মানুষের বিশ্বাস আরও গভীর হয়ে ওঠে। প্রেরিতশিষ্যেরা যীশুকে 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার' বলে স্বীকার করেন এবং 'উনিই প্রভু' বলে প্রচার করেন।

আমরাও যীশুকে প্রভু বলে ডাকি। তাঁর নামে পিতার কাছে আমাদের প্রয়োজনের জন্য অনুনয় করি। কোনো কোনো প্রার্থনার শুরুতে তাঁকে 'হে প্রভু যীশু' বলে সম্বোধন করি। আবার সব প্রার্থনার শেষে 'প্রভু যীশুর নামে' বলে শেষ করি। কারণ তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং পিতা তাঁকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছেন। আমরা যীশুর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারি। তিনি মানবজাতিকে পরিত্রাণ এনে দিয়েছেন। তাঁর ক্ষমতা, সম্মান ও গৌরব মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে।

কাজ: যীশু খ্রিষ্ট কীভাবে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন তার ২টি উদাহরণ লেখ।

পাঠ ৫: খ্রিষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানব

এই অধ্যায়ে আমরা প্রভু যীশু খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র হিসেবে জানতে পারব। ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে, যীশু খ্রিষ্ট ঈশ্বর থেকে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনিই ঈশ্বর ও প্রভু। আমরা যীশু নামের অর্থ বুঝতে পেরেছি এবং খ্রিষ্ট হিসেবে তাঁর পরিচয় পেয়েছি। খ্রিষ্টের শিষ্য হিসেবে আমরা সবাই তা বিশ্বাস করি এবং স্বীকারও করি।

এই অধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনায় আমরা বুঝতে পেরেছি যে, যীশু ঈশ্বর, আবার তিনি মানুষ। যীশু ঈশ্বর থেকে মানুষ হয়েছেন। তিনি প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ। একজন মানুষের থাকে দেহ, মন ও আত্মা। দেহ-মন-আত্মার প্রকৃতি নিয়ে মানুষ জন্ম নেয় এবং পূর্ণাঙ্গ মানবীয় স্বভাবে বেড়ে ওঠে। মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টির অন্যান্য সবকিছু থেকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি, যা অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তু বা প্রাণীর নেই। তাই মানুষ অন্যসব জীবজন্তু থেকে আলাদা।

পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ মানব যীশু খ্রিষ্ট আত্মোৎসর্গ করেছেন

নারীগর্ভে জন্ম নিয়ে যীশু দেহ-মন-আত্মার প্রকৃতি পেয়েছেন। তিনি পূর্ণাঙ্গ মানবীয় স্বভাবে বড় হয়েছেন। মানুষের হাসিকান্না, দুঃখবেদনা কিংবা আনন্দের সাথে তিনি একাত্ম হয়েছেন। তিনি আকারে- প্রকারে ও স্বভাবে সম্পূর্ণ মানুষ। যীশুর মানবীয় স্বভাব নিয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতভেদ ছিল। মণ্ডলীর পরিচালকগণ এবং পন্ডিতগণ এই সত্য প্রকাশ করেছেন যে,যীশু ঈশ্বর থেকে আগত মানুষ।

যীশুর দুইটি স্বভাব: মানবীয় ও ঐশ্বরিক। তিনি পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণমানুষ। মানবীয় দেহ, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি এবং তাঁর সকল কার্যাবলির জন্য তিনি প্রকৃত মানুষ। মানুষ হয়েও তিনি আলাদা। কারণ তিনি মানুষ ও ঈশ্বর। ঈশ্বরত্বে ও প্রভুত্বে তিনি সম্পূর্ণ ঈশ্বর। তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে তিনি মানবজাতির পরিত্রাণ এনেছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা সকলে স্বর্গে যাবার সুযোগ পেয়েছি। যারা বিশ্বাসের পথে চলে তারা পায় নবজীবন। কারণ যীশুই পথ, সত্য ও জীবন।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ——————— প্রসাদে পূর্ণ বলে তিনি অভিহিত করলেন।

২. ঈশ্বর তাঁর ——————————আছেন।

৩. তাঁর নাম হবে ————————।

৪. তিনিই হবেন সমগ্র মানবজাতির ———————।

৫. মোশী নামের অর্থ হলো ——————— থেকে টেনে তোলা।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. তুমিই আমার	▪ জয় করেছেন
২. যীশু মৃত্যুকে	▪ যীশু আলাদা
৩. যীশুই পথ	▪ প্রকৃত মানুষ
৪. তিনি প্রকৃত ঈশ্বর ও	▪ একমাত্র পুত্র
৫. মানুষ হয়েও	▪ সত্য ও জীবন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ্রিস্ট শব্দের অর্থ কী ?

ক. মনোনীত খ. প্রেরিত

গ. অভিষিক্ত ঘ. উদ্ধারকর্তা

২. ‘প্রভু’ শব্দের দ্বারা যীশুর কী বোঝানো হয়েছে ?

ক. অলৌকিক শক্তিকে খ. ঐশ্বরিক শক্তিকে

গ. যাজকত্বকে ঘ. রাজকীয় অধিকারকে।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

দ্বীপ একজন ধার্মিক ব্যক্তি। সে বাণী প্রচারের জন্য 'ক' অঞ্চলে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে সেখানকার লোকজন নেশা থেকে শুরু করে যাবতীয় অসামাজিক কাজে লিপ্ত ও শারীরিকভাবে অসুস্থ। দ্বীপ প্রার্থনা, সেবা ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ করে তোলে।

৩. দ্বীপ কার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে উক্ত কাজ করেছিল ?

ক. পিতর খ. যীশু

গ. পৌল ঘ. যোহন

৪. দ্বীপের কাজের মাধ্যমে 'ক' অঞ্চলের লোকেরা পেতে পারে

i. নতুন জীবন

ii. সেবা

iii. ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জুঁই ডেনির বাগদত্তা স্ত্রী। ডেনি গরিব হলেও ধার্মিক, ঈশ্বরভীরু ও বিনয়ী লোক ছিলেন। তিনি সামান্য বেতনে একটা কারখানায় কাজ করতেন। তিনি নিজেকে তার স্ত্রীর অযোগ্য পাত্র মনে করলেন। তাই তিনি গোপনে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাইলেন। তিনি ফাদারের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। কিন্তু ফাদার ডেনিকে জুঁই সম্পর্কে বললেন, 'জুঁই একজন সরল, বিনয়ী ও ঈশ্বরভক্ত মেয়ে। তুমি জুঁইকে গ্রহণ করতে ভয় পেও না।' ফাদারের কথামতো ডেনি সবকিছু করলেন।

ক. যুদেয়া দেশের রাজার নাম কী ?

খ. ঈশ্বর মারীয়ার গর্ভে কেন প্রিয়তম পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন?

গ. যোসেফের কোন বৈশিষ্ট্য ডেনির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি যোসেফের ঘটনার সঙ্গে আংশিক মিল রয়েছে–এর স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও।

২. প্রশান্ত অঞ্চলের একজন সমাজসেবক। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে তিনি খুবই ধার্মিক। গ্রামের দীন দরিদ্রকে ঔষধ, কাপড় ও খাবার দিয়ে তিনি সাহায্য করে থাকেন। গ্রামবাসী প্রশান্তের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে রোগীদের তার কাছে নিয়ে আসতে লাগল যাতে তিনি তাদের স্পর্শ করে সুস্থ করে তোলেন। তিনি লোকদের বললেন, 'আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। একমাত্র যীশুই পারেন এ কাজ করতে।'

ক. মোশীহ শব্দের অর্থ কী ?

খ. যীশুকে কেন 'প্রভু' সম্বোধন করা হয় ?

গ. প্রশান্তের মধ্যে যীশুর কী ধরনের গুণাবলি ফুটে উঠেছে – বর্ণনা কর।

ঘ. প্রশান্তের মধ্যে যীশুর সব গুণের সমাবেশ ঘটেছে বলে কি তুমি মনে কর ? তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন দূত মারীয়াকে সংবাদ দিয়েছিলেন ?
২. মারীয়ার স্বামী কেমন লোক ছিলেন ?
৩. মারীয়ার পুত্রের নাম কী রাখা হয়েছিল ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুকে কেন খ্রিষ্ট নামে অভিহিত করা হয়েছে? বিশ্লেষণ কর।
২. ঈশ্বরপুত্র কীভাবে প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানব বর্ণনা কর।
৩. ঈশ্বরপুত্রের উপাধি কেন প্রভু দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের সৃষ্টি উত্তম

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সব সৃষ্টিই উত্তম। সকল সৃষ্টির মাঝেই রয়েছে ঈশ্বরের মহত্ত্বের প্রকাশ। ঈশ্বরের সৃষ্টির একটা প্রধান উদ্দেশ্য আছে, আর তা হলো ঈশ্বরেরই গৌরব। তিনি সুন্দর ও পবিত্র, তিনি বিশ্বময় বিরাজিত। সব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। মানুষকে দেওয়া হয়েছে সমস্ত সৃষ্টির ওপর আধিপত্য করার অর্থাৎ যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব। সমস্ত সৃষ্টির প্রতি যত্ন নেওয়া মানুষের একটি অন্যতম দায়িত্ব। একই সাথে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা ও গৌরব করা মানুষের কর্তব্য।

সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- 'প্রত্যেক সৃষ্টিই উত্তম'– ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- সুন্দর সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসামূলক প্রার্থনা করব।

পাঠ ১: পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টির রহস্য গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের সকল মুক্তি পরিকল্পনার ভিত্তি, মুক্তির ইতিহাসের শুরু। "আদিতে পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন" (আদি পুস্তক ১:১)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা।

সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হয়েও স্বাধীন ইচ্ছার বলে মানুষ পাপ করেছে। মানুষের পাপের ফলে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সৌন্দর্য নষ্ট বা ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংসের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করতেই ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করেছেন। পুত্রের আগমনে সৃষ্টি-রহস্যের পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টের বিষয়ে আমরা জানতে পেরেছি। আদি থেকেই খ্রিস্ট যীশুতে এই নব সৃষ্টির রহস্য স্থির করে রাখা হয়েছিল।

জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কোনো কিছুর সহায়তারও প্রয়োজন হয়নি। সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। তিনিই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। ঈশ্বর ছয় দিনে জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন। প্রতিদিনের সৃষ্টির পর ঈশ্বর সৃষ্টির দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর চোখে সেসব 'উত্তম' হয়েছে। ষষ্ঠ দিনে, সব সৃষ্টির শেষে, তিনি 'সমস্তই অতি উত্তম' বলে ঘোষণা করেছেন (আদি পুস্তক ১:৩১)। তাই আমরা বলতে পারি ঈশ্বরের সৃষ্টি উত্তম।

"পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন।" মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এর প্রধান কারণ হলো, ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে দিয়েছেন নিজের রূপ, প্রকৃতি ও স্বভাব। মানুষের মাঝে ঈশ্বর নিজেকেই প্রকাশ করলেন। মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

সৃষ্টির অন্যান্য বস্তু ও প্রাণী থেকে মানুষ আলাদা। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সে অনন্য। মানুষ কোনো বস্তু নয় বরং ব্যক্তি। দেহ, মন ও আত্মায় এক অনন্য সৃষ্টি। মানুষের আছে জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিবেক ও ইচ্ছা শক্তি। মানুষ আত্ম–মর্যাদার অধিকারী। জ্ঞান ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের মহত্ত্বকে আবিষ্কার করতে পারে। তাঁর মহানুভবতা সে অনুভব করতে পারে, তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করতে পারে। একমাত্র মানুষই সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে।

সৃষ্ট মানুষের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই নর ও নারী উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষ। মানব ব্যক্তি হিসেবে নর ও নারী সমমর্যাদার অধিকারী। আবার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে তারা নারী ও পুরুষ। তারা কেউ কারোও অধীন নয় বা একজন আরেকজন থেকে ছোট বা বড় নয়।

ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা একে অপরের জন্য পরিপূরক হতে পারে। "মানুষের পক্ষে একা থাকা ভালো নয়; তাই আমি তার জন্যে এমনই একজনকে গড়ে তুলব, যে তাকে সাহায্য করবে, তার যোগ্য সঙ্গী হবে" (আদি পুস্তক ২:১৮)। ব্যক্তি হিসেবে তারা একক আর নারী ও পুরুষ হিসেবে তারা পরস্পরের সহায়ক বা পরিপূরক। তারা উভয়েই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতি উত্তম।

পাঠ ২: সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ

জন্মের পর থেকে আমাদের বৃদ্ধি ঘটে চলছে। এই বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা যা-কিছু দেখছি তার সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। আগে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম ও জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিখেছি। এই সুন্দর পৃথিবী নিয়ে রচয়িতাগণ ছন্দ, কবিতা, গল্প, নাটক কিংবা প্রবন্ধ লিখেন। চিত্রের মাধ্যমেও অনেকে সৃষ্টির সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেন। সৃষ্টির সৌন্দর্য নিয়ে সুন্দর সুন্দর গান রচিত হয় ও সুরে সুরে সৃষ্টির বন্দনা গীত হয়। ২০২০

সৃষ্টিকে নিয়ে আমাদের এসব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তারই গৌরব প্রকাশ পায়, তাঁরই গুণগান করা। সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে আমাদের ধ্যান ও সাধনা ব্যাপক। কারণ "সব কিছু তাঁর দ্বারাই অস্তিত্ব পেয়েছিল, আর যা–কিছু অস্তিত্ব পেল, তার কোনো কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি" (যোহন ১:১–৩)। সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি নিজেকে জগতের কাছে প্রকাশ করেছেন।

সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বরের প্রকাশ

"আদিতে পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করলেন" (আদি পুস্তক ১:১)। পবিত্র শাস্ত্রের এই প্রথম লাইনটি ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজের সূচনা প্রকাশ করে। এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি নিজেকে ছাড়া ঈশ্বর অন্য যা-কিছু বিদ্যমান সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। এ জগতে যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে সমস্তই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বরপুত্রের আগমনের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকাজের পূর্ণতা তিনি প্রকাশ করেছেন। আসলে তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। সবকিছু নির্ভর করে তাঁর ওপর। সবকিছুর মধ্য দিয়ে মূলত তিনি নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। যিনি মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং নিজেকে আরও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের জন্য একটি জাতি গঠন করেছেন, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, যিনি "স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন" (ইসাইয়া/যিশাইয় ৪৩ ঃ১)।

এই সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে মূলত ঈশ্বর তাঁর প্রেম ও ভালোবাসাকেই মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি ভালোবাসার উৎস, তিনিই ভালোবাসা। তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে ভালোবাসতে হয়। সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসতে পারি।

কাজঃ সৃষ্টির ওপর ছড়া, কবিতা বা অনুচ্ছেদ লিখে বা চিত্র অঙ্কন করে সৃষ্টি সম্পর্কে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত কর।

পাঠ ৩: প্রত্যেক সৃষ্টিই উত্তম

ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি ও সৃষ্টির উত্তমতা সম্পর্কে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে প্রতিটি মানুষের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তার চেয়ে বড় কথা হলো যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর সম্বন্ধে জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে ঈশ্বরের গৌরবার্থে। সব সৃষ্টিই কোনো না কোনোভাবে মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে। সমস্ত সৃষ্টিই অতি উত্তম । যিনি সব উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন তিনি নিশ্চয় আরও কতই-না উত্তম!

সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বর বিশ্বজগতের পূর্ণতা দিয়েছেন। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সবকিছু ছিল অন্ধকার, ফাঁকা বা শূন্য। শূন্যতার মাঝে ঈশ্বর বিচরণ করতেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন তিনি সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করবেন। সে অনুসারে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। তিনি বললেন সৃষ্টি হোক, আর সাথে সাথে সৃষ্টি হলো। তিনি ছয় দিনে জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করলেন। প্রতিদিনের সৃষ্টির পর ঈশ্বর তাঁর আপন সৃষ্টিকে 'উত্তম' বলে ঘোষণা করেছেন। ষষ্ঠ দিনে সব সৃষ্টির শেষে 'সমস্তই অতি উত্তম' বলে ঘোষণা করেছেন (আদি পুস্তক ১:৩১)। আর সপ্তম দিনে

তিনি সৃষ্টিকর্ম থেকে বিরতি নিলেন। প্রতিদিনের সৃষ্টির শেষে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে দেখলেন। বিচার-বিশ্লেষণ করলেন। নিজে নিজে মূল্যায়ন করলেন। তিনি দেখলেন তাঁর সৃষ্টি ভালোই হয়েছে। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি খুশি হয়ে বললেন, ভালো অর্থাৎ 'উত্তম' হয়েছে।

কাজ: তোমার চারপাশে সৃষ্টির কী কী উত্তম হিসেবে দেখ তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন সবই উত্তম। ঈশ্বর প্রতিদিন তাঁর সেই উত্তমতাকে উপভোগ করেছেন। যা উত্তম নয় তা হলো মানুষের পাপ, মানুষের পতন। পাপ ঈশ্বরের সৃষ্টি নয় বরং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার। লোভ ও ভোগ-বিলাসিতার উদ্দেশ্যে ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ করা যায় না। মানুষের জীবনে এগুলোর প্রয়োজন ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃতি আমাদের জীবন দেয়, খাদ্য দেয় ও আমাদের রক্ষা করে। এক উত্তম আরেক উত্তমের সেবা করে।

মানুষ সৃষ্টির পর ঈশ্বর বলেছিলেন 'অতি উত্তম' কিংবা 'সমস্তই উত্তম'। তাই তুমিও উত্তম, আমিও উত্তম, সব মানুষই উত্তম। মানুষের এই উত্তমতা প্রকাশ পায় তার আধিপত্যে ও প্রভুত্বে। মানুষের উত্তমতাকে ধরে রাখতে হলে সৃষ্টির উত্তমতাকে রক্ষা করতে হবে।

সৃষ্টির যত্ন ও তার উপর প্রভুত্ব করতে গিয়ে মানুষকে অবশ্যই সর্বপ্রথম তার নিজের উত্তমতা সুদৃঢ় করে রাখতে হবে। নতুবা সে সৃষ্টিকে উত্তমতার পথে পরিচালিত ও যত্ন করতে পারবে না। সৃষ্টিকে যত্ন করা আমাদের সকলের দায়িত্ব । ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দাস হবার জন্য নয়। ভোগ বা ধ্বংস করার জন্য নয়। মানুষ সৃষ্টির যত্ন নেবে; সৃষ্টিও মানুষের যত্ন নেওয়ার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে। সেই সেবা পাওয়ার কারণেও মানুষকে সৃষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং যত্ন করা প্রয়োজন।

প্রকৃতি নানাভাবে অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছে। ফলে প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। বর্তমান শিল্পায়নের যুগে ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার রোধ করা প্রয়োজন। এই সম্পদ গুলো নিজের ভিতরে থাকার সুযোগ পেলে আরও সমৃদ্ধ হতে পারে। কেবল ক্ষমতাশালীরাই নয়, দরিদ্র সমাজও যেন উপকৃত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার ।

সৃষ্টির সম্পদ রক্ষা করতে হলে ভোগবিলাসিতার সামগ্রী উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। মানুষের জীবন এতে আরও সহজ–সরল হবে। ভূমি, জল, বায়ু অত্যধিক দূষিত হওয়ার ফলে সৃষ্টির সম্পদগুলো মাত্রাধিকভাবে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা হয়ে যাচ্ছে। ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদির নিজস্ব সৌন্দর্য ও পবিত্রতা আছে। মোশীর কাছে ঈশ্বর জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য থেকে বলেছিলেন, "তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল, কেননা যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ তা পবিত্র ভূমি" (যাত্রাপুস্তক ৩:৫)। সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপারেই ঈশ্বরের এই কথা খাটে। সেই মন নিয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টির মাঝে বিচরণ করা প্রয়োজন। সৃষ্টিকে যত্ন নেওয়া ও মানুষকে ভালোবাসা প্রয়োজন। সৃষ্টির পরিচর্যা ও মানব সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা ও ভালোবাসতে পারি। এতে সৃষ্টির উত্তমতাও রক্ষা পায়।

কাজঃ শ্রেণির সব শিক্ষার্থী বিদ্যালয় প্রাঙ্গানে বাগান ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারে ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মানুষকে দিয়েছেন নিজের রূপ ———————— ও স্বভাব।

২. মানুষের পক্ষে —————————— থাকা ভালো নয়।

৩. নারী ও পুরুষ হিসেবে তারা পরস্পরের ——————————।

৪. এক উত্তম আরেক উত্তমের ————————————— করে।

৫. সৃষ্টি কোনো না কোনোভাবে মানুষের ——————— বয়ে আনে।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. দেহ, মন ও আত্মায়	▪ বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন
খ. মানুষের সাথে	▪ অধিকারী
গ. মানুষ আত্মমর্যাদার	▪ এক অনন্য সৃষ্টি
ঘ. সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে	▪ অতি উত্তম
ঙ. তারা উভয়েই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে	▪ মুক্তির ইতিহাসের শুরু

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঈশ্বর কিসের মধ্য দিয়ে নিজের সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন ?

ক. বাক্যের মধ্য দিয়ে খ. সৃষ্টির মধ্য দিয়ে

গ. যীশুর মধ্য দিয়ে ঘ. আশ্চর্যকাজের মধ্য দিয়ে

২. ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে কী দায়িত্ব দিলেন ?

ক. নতুন নতুন সৃষ্টি করার

খ. শুধু ভোগ করার

গ. পৃথিবীর ওপর আধিপত্য করার

ঘ. সৃষ্টিকে যত্ন ও রক্ষা করার।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অসীম গাছপালা কেটে বিভিন্ন রকম ভোগ্যপণ্য তৈরি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। তার এ পণ্য ব্যবহার করে মানুষ বিলাসিতা করে ও ঘর সাজিয়ে কিছু সুবিধা ভোগ করে। তবে তার কারখানার বর্জ্য পাশের নদীতে পড়ে পানি দূষিত হচ্ছে।

৩. যে শিক্ষা অসীমের মনোভাবের পরিবর্তন আনতে পারে তা হলো –

i. সৃষ্টিকে ভালোবাসার

ii. সহজ-সরল জীবনযাপনের

iii. ভোগ পরিহার করার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অসীমের কর্মকাণ্ডে কী প্রকাশ পায় ?

ক. ঈশ্বরের গৌরব

খ. মানুষের কল্যাণ

গ. নিজের স্বার্থ

ঘ. সৃষ্টির উত্তমতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অপূর্ব একটি সুন্দর খামার তৈরি করেছে। খামারে রয়েছে গরু, বিভিন্ন জাতের পাখি, হাঁস-মুরগি, চারা-গাছ ও বিভিন্ন রকম ফুলের বাগান। প্রতিনিয়ত সে অনেক আন্তরিকতা ও ভালোবাসা নিয়ে এগুলোর যত্ন নিয়ে থাকে। সে খামারের উন্নয়নের জন্য অনেক পরিশ্রম করে। গরুর দুধ ও বাগানের ফুল বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। নিজের চাহিদা পূরণ করেও সে দরিদ্রদের সাহায্য দিয়ে থাকে। এ কাজের মধ্য দিয়ে অপূর্ব ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করছে।

ক. ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর কী সৃষ্টি করলেন ?

খ. ঈশ্বর কেন মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন ?

গ. অপূর্ব মানুষ হিসেবে কোন দায়িত্ব পালন করছে, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে অপূর্বের কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে–উক্তিটির স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

২. দৃশ্যকল্প–১

সীমা শিক্ষাসফরে মধুপুর অঞ্চলে গিয়ে দেখতে পেল শালবনটি খুব সুন্দরভাবে সাজানো, পাখির কলকাকলিতে মুখর। শালবনের দৃশ্য ও পরিবেশ সীমাকে মুগ্ধ করল।

দৃশ্যকল্প–২

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে জয়া জানতে পারল যে, মানুষের গাছ কাটার ফলে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ যত্ন না নেওয়ার কারণে পৃথিবী তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। আর এ কারণেই প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। দিনের পর দিন পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে। জয়া মনে করে সৃষ্টিকর্তা এত সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য, আর মানুষ তা ধ্বংস করছে।

ক. জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সবকিছু কী রকম ছিল ?

খ. ঈশ্বর কেন মানুষকে অনন্য করে সৃষ্টি করেছেন ?

গ. প্রথম দৃশ্যকল্পে ঈশ্বরের কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সৃষ্টিকে যত্ন ও ভালোবাসার মাধ্যমে জয়ার জানা দৃশ্যের পরিবর্তন আনতে পারে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কী ?

২. মানুষের কর্তব্য কী ?

৩. ঈশ্বর ষষ্ঠ দিনে কী সৃষ্টি করলেন ?

৪. মোশীকে জলন্ত ঝোপের মধ্যে ঈশ্বর কী বলেছিলেন ?

৫. ঈশ্বরের সব সৃষ্টি দেখতে কেমন ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

২. সুন্দর প্রকৃতিকে রক্ষা ও যত্ন করার দায়িত্ব মানুষকে দেওয়া হয়েছে– বিশ্লেষণ কর।

৩. ঈশ্বর মানুষকে কেন নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন – বিস্তারিত বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

দেহ, মন ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছেন দেহ, মন ও আত্মা। দেহটা হলো বাইরে এবং এর চাইতে গভীরে আছে আমাদের মন। মনটা দেখা যায় না কিন্তু মনে কী হচ্ছে বা না হচ্ছে তা বাইরে থেকে অনেকটা বোঝা যায়। সবচেয়ে গভীরে হলো আমাদের আত্মা। সেখানে পৌঁছতে আমাদের অনেক সময় লাগে। তথাপি সেখানে যা থাকে তা-ই সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। আমাদের দেহ মরণশীল। দেহ নষ্ট হয়ে গেলে মনও নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু আত্মা চিরদিন টিকে থাকবে। আমাদের এই অমর আত্মার সাথে ঈশ্বরের সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের দেহ, মন ও আত্মা মিলে হয় মানবসত্তা। এই শ্রেষ্ঠ মানবসত্তা আবার নারী ও পুরুষরূপে সৃষ্ট। এই নারী ও পুরুষ সমমর্যাদার অধিকারী। এবার আমরা দেহ, মন ও আত্মাসম্পন্ন এই মানবসত্তার আরও গভীর অর্থ সম্পর্কে অবহিত হবো।

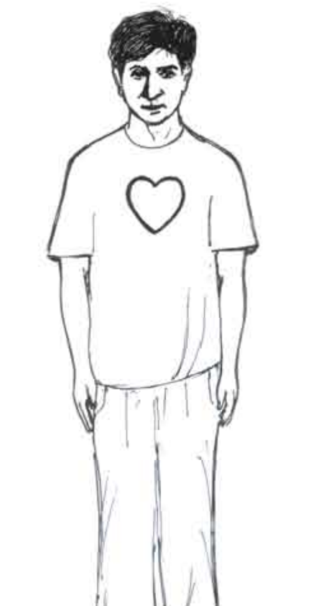

দেহ মন ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- দেহ ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- আত্মা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানুষের দেহটি আত্মিক সত্তা দ্বারা সঞ্জীবিত, তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানুষ পুরুষ ও নারীরূপে সৃষ্ট তা বর্ণনা করতে পারব।
- দেহ-মন-আত্মা পবিত্র রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ হবো।
- নারী-পুরুষ সকলকেই সম্মান ও শ্রদ্ধা করব।

পাঠ ১: দেহ, মন ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ

মানুষ একই সময়ে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক। দেহ, মন ও আত্মা এক। একটি আমের মধ্যে খোসা, শাঁস ও বীজ থাকে। সবগুলোই আমের অংশ। তিনটি মিলেই একটি আম। তেমনি দেহ, মন ও আত্মা এক। এগুলো এক মানুষেরই তিনটি অংশ। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে: "প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলা নিয়ে মানুষকে গড়লেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন; আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।" পবিত্র বাইবেলের এই বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষকে ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছামতোই সৃষ্টি করেছেন। দেহ, মন ও আত্মা দ্বারা তৈরি মানুষই হয়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমরা এবার দেহ, মন ও আত্মা সম্পর্কে জানব।

মানবদেহ: মানুষের দেহ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির মর্যাদার অংশ। দেহ হলো পবিত্র আত্মার মন্দির। কারণ মানবদেহ আত্মা দ্বারা সঞ্জীবিত। মানবদেহ খ্রিষ্টদেহের আশ্রয়ে পবিত্র আত্মার মন্দির হয়ে ওঠে। তাই মানুষের দেহ খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেহের যত্ন বা দেহের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের সচেতন থাকতে হয়।

মানবদেহের গুরুত্ব: আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। ঈশ্বরের কোনো দেহ নেই। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে একটি সুন্দর দেহ দান করেছেন। এই দেহ দৃশ্যমান এবং এর মাধ্যমে আমরা কাজকর্ম করে থাকি। মানবদেহে রয়েছে অনেকগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মানবদেহের আছে মাথা, মুখ, নাক, চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রয়েছে নিজ নিজ কাজ। যেমন মাথা দিয়ে আমরা চিন্তা করি, মুখ দিয়ে কথা বলি, কান দিয়ে শুনি, চোখ দিয়ে দেখি, হাত দিয়ে আমরা নানারকম কাজ করি, পা দিয়ে হাঁটাচলা বা দৌড়াদৌড়ি করি। মানবদেহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধী তাদের কষ্ট দেখে আমরা দেহের গুরুত্ব খুব সহজেই অনুভব করতে পারি। মানবদেহের একটি অঙ্গ বিকল হলে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। শুধু তাই নয় মানবদেহ ব্যবহার করে আমরা সব ধরনের কাজ করে থাকি। অদৃশ্য ঈশ্বরের কাজ দৃশ্যমান মানবদেহের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। মানুষের নানারকম ভাব ও অনুভূতির প্রকাশ মানবদেহের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। অনেকে বলে থাকেন, মানুষের মুখের ভাষার চেয়ে তার দৈহিক প্রকাশ অনেক বেশি জোরালো। তাই মানবদেহ অতি গুরুত্বপূর্ণ।

মানবদেহের যত্ন ও পবিত্রতা রক্ষা করা: ঈশ্বর আমাদের যে দেহ দান করেছেন তার যত্ন নেওয়া খুবই দরকার। অতিরিক্ত সাজগোজ বা দামি দামি জিনিসপত্র ব্যবহার করা মানেই কিন্তু দেহের যত্ন করা নয়। বরং দেহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ করা, অসুস্থ হলে যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া, আবহাওয়া অনুযায়ী আরামপ্রদ পোশাক-পরিচ্ছদ পরা, পরিমিত পরিশ্রম, ব্যায়াম ও বিশ্রাম গ্রহণ করা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

দেহের যত্নের সাথে সাথে দেহের পবিত্রতার বিষয়টিও আমাদের লক্ষ করতে হবে। অনেক সময় মানুষ নানাভাবে দেহের অপব্যবহার করে থাকে। যেমন, নানারকম মাদকদ্রব্য সেবন করে, দেহের সঠিক যত্ন না নিয়ে বা নিজ দেহে নানারকম আঘাত করে দেহের ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু ঈশ্বর চান আমরা আমাদের নিজেদের দেহকে সম্মান করি এবং অন্যদেরকেও সম্মান করি।

ব্যায়ামের মাধ্যমে দেহের যত্ন

দেহগত দিক থেকে আমরা যে যেমন আছি ঠিক সেইভাবেই নিজেকে গ্রহণ করা আমাদের দরকার। দেহের আকার, গঠন, গায়ের রং এগুলোকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েও আমরা আমাদের দেহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। দেহ ব্যবহার করে আমরা যেন কোনো প্রকার পাপ না-করি। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির। এই দেহে ঈশ্বর নিজেই বাস করেন।

কাজ: নিজের খাতায় নিচের ছকটির মতো একটি ছক আঁক। উল্লিখিত অঙ্গগুলো যা যা করতে পারে এমন ৩টি করে ভালো কাজ লেখ ও পাশের জনের সঙ্গে সহভাগিতা কর।

মাথা	হাত	পা
চোখ	কান	মুখ

এসো একটি রবীন্দ্র সংগীত গাই:

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি।
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যতো বাণী।
আমার চোখের চেয়ে দেখা আমার কানের শোনা
আমার হাতের নিপুণ সেবা আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে, সব দিতে হবে।

পাঠ ৩: মানবদেহের অপব্যবহার

ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এ মহাদান মানুষ সবসময় সঠিকভাবে ব্যবহার করে না। দেহের অপব্যবহারের ফলে মানুষ নানারকম জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যেমন: বর্তমানে এইডস রোগ তার মধ্যে অন্যতম। আত্মহত্যা করেও মানুষ দেহের অমর্যাদা করে থাকে। নিজেকে ঠিকভাবে গ্রহণ না করলে বা নিজের দেহকে নিয়ে সন্তুষ্ট না থাকলে আমাদের নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। অভাব, ক্ষুধা ও দারিদ্রের কারণে মানুষ তার সঠিক যত্ন অনেক সময় নিতে পারে না। এ কারণে আমরা পথে ঘাটে, ময়লার মধ্যে লোকদের পড়ে থাকতে দেখি। এসব দৃশ্য সত্যি দুঃখজনক। কখনো কখনো মানুষ মানুষকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে থাকে। অনেক সময় খুনও করে থাকে। আজকাল আমরা প্রতিদিন তা শুনতে ও দেখতে পাই। নারী ও শিশুরা শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হয় ও যৌন হয়রানির শিকার হয়। এতে মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়। দুর্ঘটনায় কবলিত হয়েও মানুষের দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এককথায় আমরা বলতে পারি যে, মানুষ কখনো নিজের ইচ্ছায় আবার কখনো পরিস্থিতির শিকার হয়ে তার এই সুন্দর দেহের অপব্যবহার করে থাকে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী: মানব সমাজে কেউ কেউ শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। তাদের অনেক কষ্ট। তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল । সমাজের এই ধরনের মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। আমরা যেন তাদের প্রতি সহৃদয় হই। তাদের যেন প্রয়োজনমতো সাহায্য-সহযোগিতা করি। পবিত্র বাইবেলে আমরা অনেকবার পড়েছি, যীশু অনেক শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীকে সুস্থ করে তুলেছেন। এইভাবে তিনি তাঁদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন।

কাজ: দৈহিক প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের প্রতি আমাদের করণীয় কী? দলে আলোচনা কর। তোমাদের বাড়ির আশেপাশে কোনো প্রতিবন্ধী থাকলে তোমরা দলবদ্ধ হয়ে তাদের দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পার। এরপর তাদের জন্য কী করা যায় তার সিদ্ধান্ত নাও।

২০২০

পাঠ ৪: মন ও মনের গুরুত্ব

ঈশ্বর আমাদের দেহ ও আত্মার সাথে দিয়েছেন একটি মন। এই মন দিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করতে পারি। যা চিন্তা করি তা অনুভব করি এবং যা অনুভব করি তা-ই আমরা কাজে পরিণত করি। মন থেকে আমরা পাই মানসিক শক্তি। মনীষীগণ বলেছেন, মানুষের মন অনেক শক্তিশালী। মন থেকে আসে ইচ্ছাশক্তি। মনের জোর বা শক্তিকে বলা হয় মনোবল। এই মনোবল হলো মানুষের একটি প্রধান চালিকাশক্তি। এটি পবিত্র আত্মার একটি বিশেষ দান। তাই মনের সুস্থতা ও পবিত্রতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতাও নির্ভর করে মানুষের মনের সুস্থতা বা অসুস্থতার ওপর। অন্যদিকে আবার দেহের সুস্থতা বা অসুস্থতা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দেহ ভালো থাকলে প্রায়ই দেখা যায় মনটাও ভালো । আবার দেহ অসুস্থ হলে অনেক সময় মনটাও খারাপ হয়ে যায়। তাই মানুষ বলে থাকে– সুস্থ দেহে সুস্থ মন। মনের পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার ওপর মানুষের আত্মার সুস্থতা নির্ভর করে । মনের কারণে আমি আমার অপরাধ বুঝতে পারি। অপরাধ আত্মার ক্ষতি করে । মন যদি বলে যে আমি অপরাধ করেছি তবে তা আত্মায় প্রবেশ করে। এ কারণে মনের প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে মানুষ তার গোটা ব্যক্তিত্ব বা মানুষটিকেই প্রকাশ করে থাকে। মনের সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার ওপর একজন মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন নির্ভর করে। এই সকল কারণেই মনের গুরুত্ব অনেক।

এমনকি শারীরিক সুস্থতার চেয়েও মনের বা মানসিক সুস্থতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ হলেও স্বাভাবিক জীবন চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু একজন মানুষ যখন মনের দিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ হয় তখন স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। মন হলো আমাদের চালিকাশক্তি। মনের শক্তি হলো বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি। বুদ্ধি দিয়ে আমরা যুক্তিসংগত চিন্তা করতে পারি। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের জীবন। ইচ্ছাশক্তি থেকে জন্ম নেয় মানুষের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা থেকে আসে ভালো বা মন্দ বোঝার ক্ষমতা বা বিচারবোধ। চিন্তাশক্তি সঠিক থাকলে মানুষের অন্য সব কাজ সঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে মন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন উপায় নির্ধারণ করা হচ্ছে।

আমাদের বিশ্বাসের জীবনেও মনের গুরুত্ব ও প্রভাব অনেক। বিশ্বাস ও মন পরস্পর সম্পর্কিত। বিশ্বাসপূর্ণ আচরণ ও কাজসমূহ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় মন দ্বারা। আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ় মনোবলের কারণেই বিশ্বাসের জন্য সাধু-সাধ্বীরা জীবন দিতে পেরেছিলেন। নানারকম কষ্টভোগ ও নির্যাতন সহ্য করতে পেরেছিলেন।

আবার অনেক সময় আমরা লক্ষ করি যে, শারীরিকভাবে অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী হলেও মনের দৃঢ়তা ও উচ্চতর চিন্তা শক্তির কারণে মানুষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আমরা বৈজ্ঞানিক স্টিফেন হকিন্স ও হেলেন কেলারের নাম এখানে স্মরণ করতে পারি। তাঁরা শারীরিক প্রতিবন্ধী হলেও তাঁদের দৃঢ় মনোবল ছিল। এ কারণে তাঁরা মানবজাতির জন্য স্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আবার অনেক সময় আমরা লক্ষ করে থাকি যে মানুষের শারীরিক সুস্থতাও মনের সুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত। মন সুস্থ ও ভালো না থাকলে মানুষ অনেকবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপের কারণে মানুষের উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও মানসিক রোগ হয়ে থাকে। মন ভালো না থাকলে অন্য কোনো কিছু করতেও ভালো

লাগে না। মনকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সব কাজ সুন্দর ও সঠিকভাবে হয়। এ কারণে বড়রা সবসময় তোমাদের বলে থাকেন মন দাও, মনোযোগী হও, সব কাজে মনোনিবেশ কর।

মনের কাজ

মনের গুরুত্ব আমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি। এবার আমরা দেখব মনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

১। মন হলো আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি। এই শক্তিকে আমরা বলে থাকি অন্তর্দৃষ্টি, যার মধ্য দিয়ে আমরা বিচার বিবেচনা করতে পারি।

২। মন গোটা মানুষটিকে চালায় ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। মন চিন্তা করতে ও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৪। মন কোনো বিষয়ের যুক্তিসংগত বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

৫। মনের একাগ্রতা কোনো বিষয়ে সাফল্য অর্জনে সাহায্য করে।

মন ভালো রাখার উপায়

অনেক সময় খুব সহজেই আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। মনের গুরুত্বের কারণেই আমাদের মন ভালো রাখতে হবে। সেইজন্য আমাদের জানা দরকার কীভাবে মন ভালো রাখা যায়। নিচে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো:

১। সব বিষয়ে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখা;

২। আত্মবিশ্বাস রাখা;

৩। ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা ও অপশক্তির দ্বারা প্রভাবিত না-হওয়া;

৪। ভালো চিন্তা ও ভালো কাজ করা;

৫। মূল্যবোধ নিয়ে সৎ জীবন যাপন করা ও নৈতিক জীবন ঠিক রাখা;

৬। সবার সাথে সদ্ভাব বা সুসম্পর্ক বজায় রাখা;

৭। সামাজিকতা রক্ষা করা, আনন্দ নিয়ে উৎসব পালন করা;

৮। নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও পরিবেশ সুন্দর রাখা;

৯। ভালো মানুষের সাহচর্য ও সান্নিধ্যে থাকা;

১০। সঠিক ও সৎ মানুষের পরিচালনা গ্রহণ করা।

এছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা আমরা নিজেরাও চিন্তা করলে বুঝতে পারি। তবে আমাদের মন ভালো রাখার দায়িত্ব নিজেদেরই।

কাজ: তোমার মন খারাপ হলে তুমি কী কর এবং মন ভালো হওয়ার জন্য কী করতে পার তা লেখ ও দলে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৫: সত্তা ও আত্মা

পবিত্র বাইবেলে সত্তা শব্দটি দিয়ে মানবজীবন বা পূর্ণ মানবব্যক্তিকে বোঝায়। এই সত্তার মাধ্যমে মানুষের আত্মাকেও বোঝায় যা সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। এই আত্মার কারণেই মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়েছে। আত্মা মানুষের মূল নীতিবোধকে বোঝায়। এই সত্তা ঈশ্বরেরই রচনা। ১৩৯ নম্বর সামসংগীত গীতসংহিতায় আমরা দেখতে পাই:

আমার অন্তরতম সত্তা তোমারই রচনা;

মাতৃগর্ভে তুমিই তো বুনে বুনে গড়েছ আমায়!

এই আমি, এই যে সৃজন, কত- না আশ্চর্য অপরূপ ,

সেই ভেবে করি আমি তোমারই গুণগান;

সবার আড়ালে আমি হচ্ছিলাম যখন রচিত,

সেই মাতৃগর্ভের গভীরে হচ্ছিল যখন এই দেহের বয়ন,

তখন আমার সত্তার কোনো কিছুই তো ছিল না তোমার অগোচর!

আমরা বিশ্বাস করি এই সত্তাই ঈশ্বরের আবাস।

আত্মা

আমরা আগেই জেনেছি যে ঈশ্বর আমাদের একটি অমর আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই আত্মার কারণেই আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। দেহ থেকে আত্মার পার্থক্য হলো– দেহের মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মা কখনো মরবে না। আত্মা হলো ঈশ্বরের দান। আত্মাকে আমরা বলি জীবন। ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। পবিত্র বাইবেলে বলা আছে যে,"প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন; আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।"

মানবদেহ আত্মিক সত্তা দ্বারা সঞ্জীবিত

মানুষকে আমরা দেহ, সত্তা, আত্মা– যাই বলি-না কেন সব মিলিয়ে মানুষ আসলে এক। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি মানুষ একটি সত্তা যা একই সময়ে দৈহিক ও আত্মিক। মানুষের দেহ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির মর্যাদার সহভাগী। শুধু দেহের কোনো গুরুত্ব নেই। আত্মার সংস্পর্শে এসে এই দেহ মর্যাদা লাভ করে ও গৌরবান্বিত হয়। আত্মিক সত্তা দ্বারা মানবদেহ সঞ্জীবিত হয় অর্থাৎ জীবন পায়। এই দেহ খ্রিস্টদেহের আশ্রয়ে পবিত্র আত্মার মন্দির হওয়ার জন্য সৃষ্ট।

১। আত্মা ও দেহের সম্পর্ক অতি নিবিড়। আত্মিক সত্তার কারণে মানবদেহ সজীব হয়ে ওঠে। দেহ ও আত্মা মিলে একটি অভিন্ন মানুষ গড়ে ওঠে, যার মধ্যে তার স্বভাব প্রকাশ পায়।

২। প্রতিটি আত্মিক সত্তা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, তা শুধুমাত্র পিতামাতার দ্বারা উৎপন্ন নয়। মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। মৃত্যুর সময় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তা কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় না। আমরা এ-ও বিশ্বাস করি, অন্তিম দিনে পুনরুত্থিত দেহের সাথে তা আবার এক হবে।

৩। সাধু পল/পৌল প্রার্থনা করেন, যেন ঈশ্বর তাঁর জনগণকে পূর্ণমাত্রায় পবিত্র করে তোলেন : "তাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ প্রভু যীশু খ্রিস্টের সেই আগমনের জন্য অনিন্দ্যনীয় করে রাখেন।" এখানে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ তার আপন যোগ্যতার অনেক বেশি ঊর্ধ্বে এবং বিশেষ অনুগ্রহ লাভের মাধ্যমেই সে ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্য উন্নীত হতে পারে।

এই বিষয়গুলো অতি নিগূঢ় ও রহস্যময়। আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বুঝতে পারা কঠিন কিন্তু বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা তা গ্রহণ করি। এটি হলো ধ্যানের বিষয়।

কাজ: একটি সুন্দর ও নীরব পরিবেশে সবাই শান্ত হয়ে বস। চোখ বন্ধ কর। পাঁচ মিনিট ধ্যান কর। তোমাকে ঈশ্বর দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

পাঠ ৬: মানুষ পুরুষ ও নারীরূপে সৃষ্ট

মানুষ যেন একা না থাকে, সেই জন্যে ঈশ্বর প্রথমে এই সুন্দর পৃথিবী ও প্রাণিকূল এবং অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবশেষে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে তিনি সৃষ্টি করলেন পুরুষ। এই প্রথম মানুষ হলেন আদম। তাঁকে তিনি রাখলেন স্বর্গের এদেন বাগানে। কিন্তু ঈশ্বর আদমের নিঃসঙ্গতা বুঝতে পারলেন। তাই একসময় ঈশ্বর বললেন: "মানুষের একা থাকা ভালো নয়। তাই আমি এখন তার জন্যে এমনই একজনকে গড়ে তুলবো যে তাকে সাহায্য করবে, তার যোগ্য সঙ্গী হবে।" ঈশ্বর মাটি দিয়ে স্থলভূমির সব জীবজন্তু ও আকাশের পাখিকে সৃষ্টি করলেন। তারপর মানুষকে তিনি বললেন সমস্ত প্রাণীদের নাম রাখতে। মানুষ অর্থাৎ আদম সবকিছুর নাম রাখলেন। কিন্তু এসব প্রাণীর মধ্যে মানুষের সঙ্গী হবার মতো কাউকে পাওয়া গেল না। কারণ মানুষ অন্য পশুপাখির চেয়ে আলাদা। মানুষের প্রকৃত অভাব নিঃসঙ্গতা তখনো মিটেনি।

তখন ঈশ্বর আদমের ওপর নামিয়ে আনলেন এক তন্দ্রার ভাব। সে ঘুমিয়ে পড়ল। এই সময় তার একটি পাঁজর খুলে নিয়ে তিনি মাংস দিয়ে ওই জায়গাটি ঢেকে দিলেন। তার বুক থেকে খুলে নেওয়া সেই পাঁজর দিয়ে প্রভু ঈশ্বর গড়ে তুললেন একটি নারী বা হবাকে, তারপর মানুষের কাছে তাকে নিয়ে এলেন। তখন মানুষ বলে উঠল:

"অবশেষে এ-ই তো আমার অস্থির অস্থি, আমার মাংসের মাংস! এর নাম হবে নারী, কেননা নরদেহ থেকেই একে তুলে আনা হয়েছে!"

সেই জন্যে মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং তারা দুইজন একদেহ হয়ে ওঠে। এভাবেই সৃষ্টি হলো পুরুষ ও নারী।

নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমতা ও পার্থক্য

ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমের মতো করে নারী অর্থাৎ হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন, যার স্বরূপ একবারে তাঁরই মতো। পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টি অবলম্বন করে আদমের জীবনসঙ্গিনীর সৃষ্টি হয়নি। বরং মানুষের দেহটির এক অংশ নিয়েই সে তৈরি হয়েছে। তাইতো মানুষ নারীকে দেখামাত্রই বুঝতে পেরেছে, সে-ই তার যোগ্য সঙ্গিনী। তাঁর সঙ্গে তার দেহ মনের আত্মীয়তা বা সম্পর্ক রয়েছে। তারা দুইজনেই সমানভাবে মানবসত্তার অধিকারী, কিন্তু ভিন্নভাবে। কারণ পুরুষ পুরুষই আর নারী নারীই। তাদের দুইজনেরই প্রথম পরিচয়– তারা

মানুষ। তবে তারা পরস্পরের পরিপূরক। এ কারণেই তারা একে অন্যের সাথে মিলিত হতে চায়। তারা পরস্পরের প্রতি মিলনের আর্কষণ অনুভব করে। তবে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার সমতা ও পার্থক্যগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

সমতা	পার্থক্য
১। ঈশ্বর তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি নারীকেও তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।	১। শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। বিশেষত পুরুষ ও নারীর যৌন অঙ্গাগুলো ভিন্ন। এর মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারীকে আলাদাভাবে চেনা যায়। তাছাড়া পুরুষের দেহ তুলনামূলকভাবে শক্ত; কিন্তু নারীর দেহ কোমল। পোশাক-পরিচ্ছদেও পার্থক্য আছে।
২। পুরুষ দেহ, মন ও আত্মা নিয়ে যেমন মানুষ, নারীও তার দেহ, মন ও আত্মা নিয়ে একজন মানুষ।	২। ঈশ্বরপ্রদত্ত বিশেষ কিছু ক্ষমতা পুরুষ ও নারীভেদে ভিন্ন। যেমন নারীদের সন্তানধারণ ও জন্মদানের ক্ষমতা আছে, যা পুরুষদের নেই।
৩। পুরুষের যেমন দৈহিক, আত্মিক, মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজন রয়েছে মানুষ হিসেবে নারীর প্রয়োজনও একই রকম।	৩। ভাব বিনিময়, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে বা কাজ করার ধরনের বেশ ভিন্নতা লক্ষণীয়। পুরুষরা অপেক্ষাকৃত কঠোর, সব অনুভূতি সহজে প্রকাশ করতে পারে না। নারীরা তুলনামূলকভাবে কোমল ও আবেগপ্রবণ।
৪। পুরুষের যেমন আত্মমর্যাদাবোধ ও অধিকার রয়েছে, নারীর রয়েছে সমান মর্যাদাবোধ ও অধিকার।	৪। পুরুষেরা শারীরিক শক্তি বা বাহুবলে বিশ্বাসী। নারীদের জোর থাকে মন ও হৃদয়ে। নারীদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বেশি।
৫। পুরুষসুলভ অনেক গুণ নারীর মধ্যেও আছে এবং নারীসুলভ অনেক গুণ পুরুষের মধ্যেও আছে।	৫। গুণগত দিক থেকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে।
৬। নারীরা পুরুষের মতো যে–কোনো কাজ করার যোগ্যতা রাখে।	৬। সামাজিক বিবেচনায় বিশেষভাবে পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য ও পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। নারীদের নানাভাবে হেয় করা হয়। অনেকভাবে তাদের অধিকারবঞ্চিত করা হয়। পুরুষ ও কন্যাশিশুর মধ্যে সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য লক্ষণীয়।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো আমরা সাধারণভাবে খেয়াল করে থাকি। তবে মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে একজন পুরুষের ৫১% ভাগ হলো পুরুষসত্তা এবং বাকি ৪৯% ভাগ হলো নারীসত্তা। এই দুই মিলে হলো একজন পরিপূর্ণ পুরুষ। আবার একজন নারীর ৫১% ভাগ হলো নারীসত্তা এবং বাকি ৪৯% ভাগ হলো পুরুষসত্তা। এই দুই মিলে হলো একজন পূর্ণ নারী। কিন্তু পুরুষ ও নারী উভয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তারা সবাই সমান। তারা ভিন্ন হলেও পরস্পরের পরিপূরক ও তারা সমান। তারা কেউ ছোট বা বড় নয়। বরং তারা মানুষ হিসেবে সমমর্যাদার অধিকারী।

কাজ: তোমার পরিবার বা আশেপাশে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে বৈষম্য ও পার্থক্যগুলো তুমি দেখ তার পাঁচটি লেখ এবং ছোট দলে সহভাগিতা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. সামাজিক বিবেচনায় বিশেষভাবে ——————— সমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য করা হয়।

২. ঈশ্বর আমাদের ——————— আত্মা সৃষ্টি করেছেন।

৩. ——————— হলো ঈশ্বরের দান।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আত্মা মানুষের	▪ তৈরি মানুষই হয়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠ
২. মানুষের দেহ	▪ মূল নীতিবোধকে বোঝায়
৩. মানুষের আত্মা	▪ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির মর্যাদার সহভাগী
৪. দেহ, মন ও আত্মা দ্বারা	▪ অবিনশ্বর
৫. ঈশ্বর আমাদের	▪ একটি সুন্দর দেহ দান করেছেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমাদের চালিকাশক্তি কোনটি ?

ক. দেহ

খ. মন

গ. পা

ঘ. মাথা

২. আত্মা বলতে কী বোঝায় ?

ক. মানুষের সত্তা

খ. মানুষের দেহ

গ. ঈশ্বরের দান

ঘ. ঈশ্বরের সাদৃশ্য

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

গৌতম ও যোয়াকিম ভালো বন্ধু ও ঈশ্বরভক্ত। যোয়াকিম শ্রেণিতে সবসময় পিছনের বেঞ্চে বসে, শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করে। কিন্তু গৌতম তার বিপরীত। গৌতম, যোয়াকিমের এই অবস্থা লক্ষ করে তার দিকে এগিয়ে আসে ও সাহায্য করে। পরবর্তীতে যোয়াকিম বিদ্যালয়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

৩. যোয়াকিমের চরিত্রে কোন দিকটির অভাব পরিলক্ষিত হয় ?

ক. ক্ষমতা খ. মনোবল

গ. পবিত্রতা ঘ. বিশ্বাস

৪. গৌতমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে হবে –

i. আত্মপ্রত্যয়ী
ii. উৎসাহী
iii. কষ্টভোগী

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মি. যোসেফের দুই সন্তান, রনি ও সুমি। খাবার খাওয়ার সময় মি. যোসেফ রনিকে উৎকৃষ্ট খাবারের অংশটি থালায় তুলে দেন, কারণ বাবার ইচ্ছা রনি ডাক্তার হবে। পড়াশুনায় ভালো করার জন্য রনি ও সুমিকে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করলেন। সুমি তার নিজের ইচ্ছায় পড়াশুনা করে। ফলাফলে দেখা যায়, সুমির একাগ্রতার কারণে পরীক্ষার ফলাফল রনির তুলনায় ভালো হলো।

ক. ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করার পর কী ভাবলেন ?
খ. আত্মা ও দেহের সম্পর্ক কেমন ?
গ. যোসেফের কার্যক্রমের আলোকে সমাজে নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা কর ?
ঘ. রনি ও সুমির চরিত্রের আলোকে নারী ও পুরুষের সমতার বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

২. সৌরভ মা-বাবার একমাত্র সন্তান। কিন্তু অন্যান্য ছেলেদের মতো সে স্বাভাবিক নয়। শারীরিকভাবে সে প্রতিবন্ধী। ঈশ্বরের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে নিজের কাজ নিজে করার শক্তির জন্য প্রার্থনা করত। এতে তার জে.এস.সি'র ফলাফল ভালো হলো। সে সরকারি বৃত্তি পেল। অন্যদিকে তার বন্ধু পলাশ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও রং কালো বলে মনোকষ্টে ভোগে। কোনো কাজ মনোযোগ দিয়ে করতে পারে না। ফলে মানসিক চাপের কারণে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ক. দেহের যত্নের সাথে সাথে কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে ?
খ. মানবদেহের অপব্যবহার বলতে কী বোঝায় ?
গ. উদ্দীপকে সৌরভের কী ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. পলাশ তার অবস্থা পরিবর্তনে কী কী উপায় অবলম্বন করতে পারে বলে তুমি মনে কর। তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানব সত্তা কী কী নিয়ে হয় ?
২. মানবদেহ বিকল হলে কী হয় ?
৩. মানুষের আত্মার সুস্থতা কিসের ওপর নির্ভর করে ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মন ভালো রাখার উপায়গুলো কী ?
২. মানবদেহ আত্মিক সত্তা দ্বারা সঞ্জীবিত হয়, ব্যাখ্যা কর।
৩. নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমতা ও পার্থক্যগুলো লেখ।

চতুর্থ অধ্যায়

পাপ

স্বজ্ঞানে মানুষ পাপ করতে পারে আবার অনেক পাপ করা থেকে সে বিরতও থাকতে পারে। তাই মানুষকে প্রথমেই পাপ করা বা না-করার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যারা নিজেদের গৃহীত এই সিদ্ধান্তে অটল থাকে তারা পবিত্রতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে। যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে তা পালন করে না, তাদের মধ্যে অবহেলার ভাবই বেশি। আর যারা পাপ করা থেকে বিরত থাকার কোনো সিদ্ধান্তই নেয় না, তাদের মধ্যে পাপের চেতনার অভাব। এখানে আমরা পাপ কী, পাপের প্রকারভেদ এবং পাপ থেকে মুক্তিলাভের উপায় নিয়ে আলোচনা করব। এর মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে পাপবোধ সম্পর্কে নতুন চেতনা জেগে উঠবে।

পাপের জন্য অনুতপ্ত ব্যক্তি

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- পাপের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পাপের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- সপ্তরিপু সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সপ্তরিপু দমনের মাধ্যমে ধূমপান ও সকল প্রকার মাদকদ্রব্য সেবনের হাত থেকে দূরে থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- পাপের ফল বর্ণনা করতে পারব।
- পাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- পাপ কাজ থেকে দূরে থাকব ও সৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হবো।

পাঠ ১ : পাপ

যে কাজ, কথা, চিন্তা বা অবহেলার দ্বারা আমরা ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসার বিরোধিতা করি অথবা ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে দূরে চলে যাই, তা–ই পাপ। পাপ হলো বুদ্ধিশক্তি, সত্য ও শুদ্ধ বিবেকের বিরুদ্ধে অপরাধ। পাপের মধ্য দিয়ে আমরা নিজের মধ্যে অথবা অন্য কোনো সৃষ্ট বিষয়ে অতিরিক্ত আসক্ত হই। এই কারণে আমরা ঈশ্বর ও মানুষকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসতে ব্যর্থ হই। পাপের কারণে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। পাপ মানুষের সুন্দর ও সুকোমল স্বভাবকে ধ্বংস করে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সংহতি বা সমন্বয়কে নষ্ট করে ফেলে। এখন আমরা বলতে পারি, পাপ হলো চিরকালীন বা শাশ্বত বিধানের বিপরীতধর্মী চিন্তা, ইচ্ছা, কথা ও কাজ। আদিপাপের মতো আমাদের অন্য সকল পাপগুলো হচ্ছে অবাধ্যতা ও ঈশ্বরের বিরোধিতা করা। পাপ হলো ঈশ্বরকে উপেক্ষা করে নিজেকে ভালোবাসা বা নিজেকে প্রাধান্য দেওয়া।

কাজ: একটু সময় নাও, নীরব হও ও চিন্তা কর, ধ্যান কর– তুমি কোন প্রকার পাপ কর।

পাপের প্রকারভেদ

পাপের প্রকার অসংখ্য। আমরা অনেকভাবে বিভিন্নরকম পাপ করে থাকি। গালাতীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল বলেছেন: আমাদের মধ্যে একটি নিম্নতর স্বভাব অর্থাৎ দেহ বা আবেগের বশে চলার স্বভাব রয়েছে। এই নিম্নতর স্বভাবটি পবিত্র আত্মার বিরোধিতা করে। আর এই নিম্নতর স্বভাবের বশে চললেই আমরা পাপ করি। এভাবে যে পাপগুলো করে থাকি সেগুলো হলো: ব্যভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্রসাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ-উৎসব, আরও এই ধরনের সব কাজ। যারা এই ধরনের কাজ করে তাদের সম্পর্কে এই সতর্কবাণীও দেওয়া আছে যে, তারা কখনো ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পাপের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন: পাপের প্রতি মনোভাবের দিক থেকে এক অর্থে পাপের শ্রেণিবিভাগ করা যায়, পরিবেশ-পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকেও করা যায়। আবার ঈশ্বর, প্রতিবেশী বা নিজের বিরুদ্ধে পাপ, আত্মিক ও দৈহিক কলুষতা, আবার চিন্তা, কথা, কাজ বা অবহেলাজনিত পাপ– এসব দৃষ্টিকোণ থেকেও পাপের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। প্রথমে দেখা যাক পাপের গুরুত্বের দিকটা। পাপের গুরুত্ব অনুসারে পাপকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা: মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপ। নিচে এই দুইরকম পাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপ

মারাত্মক পাপ হলো ঈশ্বরের বিধান গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করা। এই পাপের ফলে মানুষের অন্তরের ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। নিম্নতর স্বভাবের প্রতি আসক্ত হয়ে জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য ঈশ্বরের কাছ থেকে সে অনেক দূরে সরে যায়। ঈশ্বর, যিনি পরম সুখ, তাঁর কাছ থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জীবনের প্রাণশক্তি ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। মারাত্মক পাপের ফলে মানুষ আত্মার দিক থেকে মরে যায়। যেমন: মানুষ খুন করা, ঈশ্বরনিন্দা করা ইত্যাদি।

অন্যদিকে লঘু পাপ হলো কম গুরুতর বিষয়ে নৈতিক বিধানের নির্দেশিত নীতি অমান্য করা। অর্থাৎ সামান্য বিষয়ে মানুষ যখন ঈশ্বরের অবাধ্য হয় তখন আমরা তাকে বলি লঘু পাপ। অনেক সময় মানুষ এই কাজগুলো করে পূর্ণ জ্ঞান অথবা সম্পূর্ণ সম্মতি ছাড়া। এখানে মানুষের অন্তরের ভালোবাসা সামান্য পরিমাণে ব্যাহত হতে

২০২০

পারে। তবে লঘু পাপের কারণে ভালোবাসা দুর্বল হয়। যেমন: মিথ্যা কথা বলা, মাত্রাতিরিক্ত হাসি-তামাশা করা, অত্যাধিক কথা বলা ইত্যাদি। এখানে মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো:

মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপ

মারাত্মক পাপ	লঘু পাপ
১। গুরুতর বিষয়ে ঈশ্বরের বিধান অমান্য করা ।	১। সামান্য বা ছোট বিষয়ে ঈশ্বরের বিধান অমান্য করা ।
২। ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং ঐশ করুণা বঞ্চিত হলে মানুষ মারাত্মক পাপ করে।	২। লঘু পাপে ভালোবাসা দুর্বল হয়ে যায়। তবে পবিত্রকারী কৃপা, ঈশ্বরের সাথে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা তথা শাশ্বত সুখ থেকে মানুষ পুরোপুরি বঞ্চিত হয় না।
৩। বিদ্বেষ সহকারে, সুচিন্তিতভাবে মন্দকে বেছে নেওয়া মারাত্মক পাপের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।	৩। অজ্ঞতা বা পুরোপুরি না- বুঝে আজ্ঞা লঙ্ঘন করা লঘু পাপের বৈশিষ্ট্য।
৪। ব্যক্তি, স্থান বা সময়ের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন: একজন অপরিচিত লোকের প্রতি সহিংস হবার চেয়ে নিজের জন্মদাতা পিতামাতার প্রতি সহিংস হওয়া নিশ্চয়ই অধিকতর মারাত্মক বিষয়।	৪। লঘু পাপের বেলায়ও বিষয়টি প্রযোজ্য তবে কিছুটা শিথিলতা আছে।

পাপ বিষয়ে গভীরভাবে জানতে হলে কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। বিষয়গুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। ঈশ্বরের ক্ষমা, পরিত্রাণ ও ঐশ কৃপায় সর্বদা বিশ্বাস করা। কারণ তিনি অসীমরূপে ক্ষমাশীল। তিনি সবসময় অপেক্ষা করেন কখন আমরা তাঁর কাছে ফিরে আসব। পাপ থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

২। কখনো নিরাশ না-হওয়া। ঈশ্বরের ওপর সবসময় আস্থা ও আশা রাখা।

৩। পাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৪। পাপের পথ পরিহার করার ইচ্ছা থাকা।

৫। সঠিক বিবেক গড়ে তোলা ও বিবেকের নির্দেশমতো পথ চলা।

৬। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার সঠিক ব্যবহার করা।

৭। ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন তবে পাপীকে নয়– একথা সবসময় মনে রাখা।

কাজ: পাঁচটি মারাত্মক পাপ ও পাঁচটি লঘু পাপের নাম লেখ ।

পাঠ ২: ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ

ঈশ্বর আমাদের দশটি বিশেষ আজ্ঞা দিয়েছেন যেন আমরা এই পৃথিবীতে তাঁর পথে চলতে পারি ও পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। পূর্বে আমরা আজ্ঞাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি। পবিত্র জীবন যাপন করার ও পাপ থেকে বিরত থেকে সুপথে চলার জন্য এই আজ্ঞাগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এগুলো পালনে

ব্যর্থ হলে আমরা পাপ করে থাকি। অর্থাৎ আজ্ঞাগুলোর মধ্যে যে নিষেধাজ্ঞাগুলো রয়েছে তার মধ্যে পাপ সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া আছে। দশ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আমরা যেভাবে পাপ করে থাকি সেগুলো হলো:

১। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা করে বা অন্য কিছুতে আসক্ত হওয়া।

২। ঈশ্বরের পবিত্র নামের অবমাননা করে। অকারণে ঈশ্বরের নাম নিয়ে।

৩। বিশ্রামবার পালন না-করে ও প্রভুর প্রশংসা না- করে।

৪। পিতামাতা ও গুরুজনকে সম্মান না-করে।

৫। নরহত্যা করে।

৬। ব্যভিচার করে বা অবৈধ সম্পর্ক রেখে।

৭। চুরি করে।

৮। মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে।

৯। অন্যের জিনিসে লোভ করে।

১০। অন্যের স্বামী বা স্ত্রীতে লোভ করে।

কাজঃ তুমি কীভাবে দশ আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ না- করে চলতে পার তা চিন্তা করে লেখ ।

পাপ-প্রবণতা

পাপ থেকে পাপের জন্ম হয় বা পাপ-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বারবার একই পাপকাজ রিপুর জন্ম দেয়। সাতটি বিশেষ পাপ স্বভাবকে বলা হয় সপ্তরিপু। সপ্তরিপুর নামগুলো হলো: অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, ক্রোধ, কামুকতা, পেটুকতা ও আলস্য। এগুলো পাপের প্রধান কারণ বা এগুলো অন্যান্য আরও পাপ বা কুপ্রবৃত্তির জন্ম দেয়। নিচে এই সাতটি রিপু বা পাপ-প্রবণতার ব্যাখ্যা করা হলো:

১। অহংকার : নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় ভাবা বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা; নিজেকে বা আমিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া। অহংকারের কারণে মানুষ ঈশ্বর ও মানুষকে সম্মান করা থেকে বিরত থাকে। আমরা জানি, স্বর্গদূতদের পতন হয়েছিল কারণ তারা নিজেদেরকে বড় মনে করেছিল আর ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল। আমাদের আদি পিতামাতাও ঈশ্বরের সমান হতে চেয়েছিলেন বলে তাঁরা অবাধ্য হয়েছিলেন ও পাপ করেছিলেন। বর্তমানকালেও আমরা দেখি এমন অনেক মানুষ আছে যাদের অনেক ধনসম্পদ বা টাকাপয়সা আছে বলে তারা অন্যদের খুব হেয় মনে করে। অনেকে তাদের অনেক বুদ্ধি বা বিশেষ গুণ আছে বলেও তারা নিজেদের খুব বড় মনে করে, আর খুব অহংকারী হয়ে ওঠে। এভাবে আমরাও অনেক সময় অহংকার করে পাপ করি।

২। লোভ: যা আমার নয় বা পাবার সম্ভাবনাও নেই তা নিজের করে পাবার বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা। লোভের বশবর্তী হয়েও মানুষ পাপ করে থাকে। যে জিনিস আমার নিজের নয় তা আমি নিজের করে পেতে চাইলে আমি লোভ করে পাপ করি। যেমন, ক্লাসে এক বন্ধু অনেক সুন্দর একটি কলম স্কুলে নিয়ে এলো, সেটি দেখে আমি হয়তো মনে মনে বলছি, এই কলমটি আমার চাই। এভাবে অন্যের জিনিসের প্রতি আমরা লোভ করে পাপ করি।

৩। ঈর্ষা: অন্যের ভালো বা সুখ সহ্য করতে না- পারা বা তার জন্য মনে মনে কষ্ট পাওয়া। ঈর্ষা হলো অন্যের ভালো সহ্য করতে না- পারা বা অন্যের ভালোর জন্য মন খারাপ করা। অনেকবার আমাদের এরকম হয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাসে যে মেয়েটি বা ছেলেটি প্রথম হয় বা শিক্ষক হয়তো বা কোনো এক শিক্ষার্থীর প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দেন। আমি তা সহ্য করতে পারি না। মনে মনে আমার খুব রাগ হয়। তার বিরুদ্ধে

নানারকম কথাও বলি। ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমরা একে অন্যের ক্ষতি করতে পারি। ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ফরিসিরা যীশুকে ক্রুশ দিয়ে মেরেছিল।

৪। **ক্রোধ**: কোনো বিষয়ে রেগে যাওয়া। ক্রোধ বা রাগ হলো কোনো বিষয়ে নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারা। শুধু তাই নয়, রেগে গিয়ে ক্ষতিকর কিছু করে ফেলা। আমরা বলতে শুনি রেগে গেলে মানুষ বন্য পশুর মতো হিংস্র হয়ে যায়।

ক্রোধের কারণে ঝগড়া

নিজেরাও লক্ষ করি, রেগে গিয়ে আমরা পরিবেশ নষ্ট করি, খারাপ কথা বলে ফেলি, জিনিসপত্র ভেঙে ফেলি, অন্যকে আঘাত করি। কখনো কখনো রেগে গিয়ে এক মানুষ অন্য মানুষকে মেরেও ফেলে। কিন্তু রাগ করে ক্ষতিকর কিছু করে তার পরে মানুষ নিজের অপরাধ বুঝতে পারে ও অনুতপ্ত হয়।

৫। **কামুকতা**: ঈশ্বর আমাদের যৌনবাসনা দিয়েছেন গঠনমূলক কাজে ব্যবহার জন্য। যখন এই বাসনার অপব্যবহার করি তখন এটি পাপ। অনিয়ন্ত্রিত যৌন বাসনাকে বলা হয় কামুকতা। মানুষকে ভোগের জন্য কামনা , বিরক্ত করা, কটূক্তি করা, লালসার দৃষ্টিতে তাকানো, কুনভাবে তাকানো ইত্যাদি হলো কামুকতার কিছু উদাহরণ। আজকাল আমরা প্রায়ই দেখি ও শুনে থাকি কত রকম যৌন অনাচার ঘটছে। শিশু, যুবতী–কেউ নিরাপত্তা পাচ্ছে না। যৌনপ্রবৃত্তি মানুষকে পশুতে পরিণত করে। যারা সংযমী নয় তারা নানাভাবে পাপ করে থাকে।

৬। **পেটুকতা**: খাবারের প্রতি অতিরিক্ত লোভ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে চাওয়া ও খাওয়া, বার বার খেতে চাওয়া বা দুইচোখে যা দেখে তাই খেতে চাওয়া ও খাওয়া। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাদ্য দরকার। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার খাওয়া পাপ। পেটুকতার কারণে মানুষের নানারকম অসুখবিসুখও হতে পারে।

৭। **আলস্য**: আধ্যাত্মিক চর্চা ও কাজের প্রতি অনীহা। আধ্যাত্মিক অনুশীলনে অবহেলা করা এবং কাজ না-করে শরীর বাঁচিয়ে চলা। অকর্মণ্য অবস্থায় সময় নষ্ট করা। ঈশ্বর আমাদের দেহ, মন ও আত্মা দিয়েছেন। আমরা যেন আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও কায়িক পরিশ্রম করে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারি। কিন্তু কিছু মানুষ পরিশ্রম করতে প্রস্তুত নয়। তারা খুব অলস ও আরামপ্রিয়। অলসতা করেও আমরা পাপ করি।

পাঠ ৩: সপ্তরিপু দমন

সপ্তরিপু যেহেতু পাপ বৃদ্ধির সহায়ক তাই আমাদের শিখতে হবে কীভাবে আমরা এই রিপুগুলোকে বশ করতে পারি।

১। নম্রতার অনুশীলন, নিজের মতো করে অন্য সকলকেও গুরুত্ব দেওয়া ও সম্মান করা;

২। লোভ না-করে নিজের যা বা যতটুকু আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা;

৩। অন্যের ভালোতে খুশি হওয়া ও আনন্দ করা, প্রশংসা করা ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া;

৪। উগ্র স্বভাব পরিহার করে সবকিছুতে ও সব অবস্থায় কোমল ও মৃদু আচরণ করা;

৫। সংযমগুণের অনুশীলন করা;

৬। পরিমিত আহার গ্রহণের অভ্যাস করা;

৭। সকল বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং অবহেলা না করা।

কাজ: সপ্তরিপুর মধ্যে কোন্ তিনটি রিপুর বশবর্তী হয়ে তুমি বেশি পাপ কর? আর পাপ না- করার শক্তি চেয়ে ঈশ্বরের কাছে একটি প্রার্থনা লেখ।

পাপের ফল

আমরা সবাই ভালো, সুন্দর ও সুখী জীবন যাপন করতে চাই। সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে চাই। পৃথিবী সুন্দর হোক, সব জায়গায় শান্তি বিরাজ করুক, কোথাও কোনো যুদ্ধ-বিবাদ না ঘটুক– এটাই আমাদের সবার কামনা। কিন্তু প্রতিদিন আমরা নানাভাবে কষ্ট পাই, আমরা একে অন্যকে কষ্ট দিয়ে থাকি। নিজেদের পাপ স্বভাবের যে ফল তা আমরা চারিদিকে দেখতে পাই। অর্থাৎ আমাদের পাপের ফল আমরা ভোগ করে থাকি। পাপের ফলে আমাদের মধ্যে দেখা যায়:

১। অশান্তি ও অমিল
২। দুঃখ ও যন্ত্রণা
৩। নানারকম অসুস্থতা
৪। বিবাদ ও বিচ্ছেদ
৫। যুদ্ধ ও মারামারি
৬। অন্যায় ও অন্যায্যতা
৭। ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট
৮। নিঃসঙ্গতা
৯। হতাশা ও নিরাশা
১০। মৃত্যু

কাজ: পাপের ফলে তোমার ব্যক্তিগত জীবনে কী হয় তা দলে সহভাগিতা কর এবং একটি পোস্টার তৈরি কর।

পাঠ ৪: পাপ থেকে মুক্তিলাভের উপায়

আদি পিতামাতার মধ্য দিয়ে মানুষের ইতিহাসে পাপ প্রবেশ করার সাথে সাথে দয়ালু পিতা ঈশ্বর মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে এ জগতে পাঠিয়ে তিনি মানবজাতির পরিত্রাণ সাধন করবেন–এই প্রতিশ্রুতি তিনি মানবজাতিকে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা। তিনি শুধু চান আমরা পাপ থেকে মন ফেরাই এবং মুক্তিলাভ করি। তিনি আমাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের পাপ যত বড় বা যত বেশিই হোক- না কেন, তার চেয়ে ঈশ্বরের দয়ার পরিমাণ আরও অনেক বেশি। এই কথাটি আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। পাপী মানুষ হলেও আমরা যেন কোনো অবস্থাতেই নিরাশ হয়ে না-যাই।

পবিত্র মঙ্গলসমাচারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই পাপী মানুষের প্রতি যীশু খ্রিস্টের দয়ার প্রকাশ। যোসেফের নিকট স্বর্গদূত বলেছিলেন: "তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন।" মুক্তির সংস্কার খ্রিস্টপ্রসাদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য: "আমার রক্ত, নবসন্ধির রক্ত, যা অনেকের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত।" আমাদের কোনোরূপ সাহায্য ছাড়া তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আমাদের সহযোগিতা ছাড়া তিনি আমাদের পরিত্রাণ সাধন করেন না। কিন্তু মুক্তিলাভের অনেক উপায় তিনি দিয়েছেন। নিচে কিছু উপায় তুলে ধরা হলো:

১। বিবেকের সততা ও মুক্তিলাভের আশায় পাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া;
২। নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করা;
৩। নম্রভাবে নিজের পাপ স্বীকার করা;
৪। পাপের জন্য অনুতাপ করা;
৫। পুনরায় পাপ না-করার প্রতিজ্ঞা করা;

৬। ঈশ্বরের দয়া ও কৃপায় বিশ্বাস রাখা;
৭। ক্ষমা করা ও ক্ষমা দানের মনোভাব পোষণ করা;
৯। মন পরিবর্তন করা ও স্বাধীন ইচ্ছার সঠিক ব্যবহার করা;
১০। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করা ও তাঁর প্রেরণা মতো চলা;
১১। নিয়মিত প্রার্থনা ও পবিত্র বাইবেল পাঠ করা;
১২। ঈশ্বর ও প্রতিবেশীদের সাথে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখা।

কাজঃ দুইদলে মিলে নিচের সামসংগীতটি প্রার্থনা কর।

ওগো ঈশ্বর, কে থাকতে পারবে বল, তোমার আবাসে?
কে-ই বা বাস করবে তোমার পবিত্র পর্বতে?
অনিন্দ্য যার আচরণ,
ন্যায়ধর্ম যে পালন করে,
অন্তর থেকে যে সত্যভাষী
যার রসনা করে না পরনিন্দা,
ভাইয়ের যে করে না অপকার,
প্রতিবেশীর যে রটায় না দুর্নাম,
ভ্রষ্টকে যে অবজ্ঞার চোখে দেখে,
ঈশ্বর ভক্তজনকে সম্মানই করে,
ক্ষতি হলেও আপন শপথের যে করে না অন্যথা,
ঋণ দিয়ে যে নেয় না কোনো সুদ,
নির্দোষের ক্ষতি করতে যে নেয় না কোনো ঘুষ,
এমনই যার আচরণ, সে তো কোনো কিছুতেই টলবে না কখনো

কাজঃ কীভাবে পাপ থেকে মুক্তিলাভ করা যায় প্রথমে তা দলে আলোচনা কর। তারপর ব্যক্তিগতভাবে নীরব ধ্যান কর, নিজে নিজে সংকল্প নাও– তুমি কীভাবে পাপের পথ ত্যাগ করবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. পাপ থেকে পাপের ———— হয়।
২. বেঁচে থাকার জন্য আমাদের ———— দরকার।
৩. ঈর্ষা হলো অন্যের ———— সহ্য করতে না পারা।
৪. রাগ করে ক্ষতিকর কিছু করে তার পরে মানুষ নিজের ———— বুঝতে পারে।
৫. লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ ———— করে থাকে।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পাপ মানুষের সুন্দর ও সুকোমল স্বভাবকে	▪ লঘু পাপ
২. ছোট বিষয়ে ঈশ্বরের বিধান অমান্য করাই	▪ পাপীকে নয়
৩. ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন	▪ চুরি করা
৪. দশ আজ্ঞার পাপ হলো	▪ ধ্বংস করে
৫. ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমরা	▪ অনুতপ্ত হয়
	▪ একে অন্যের ক্ষতি করি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাপের গুরুত্ব অনুসারে পাপকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ?

ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

২. ক্রোধকে দমন করা যায়

i. ক্ষমা করে

ii. ধৈর্যশীল হয়ে

iv. প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রাহুল ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে তাই সময়মতো কোনো কাজই করতে পারে না। একদিন সন্ধ্যায় পারিবারিক প্রার্থনার সময় বাবা রাহুলকে বিভিন্ন পাপ কাজ সম্পর্কে বোঝালেন এবং বললেন, এগুলো করলে আমাদের পাপ হয়। আরও বললেন, ‘তোমার এই খারাপ অভ্যাস বদলাতে হবে।’

৩. রাহুল কী ধরনের পাপ করেছে ?

ক. লোভ
খ. ঈর্ষা
গ. অহংকার
ঘ. আলস্য।

৪. রাতুল কীভাবে এ ধরনের পাপ-প্রবণতা পরিহার করতে পারে ?

ক. নম্রতার অনুশীলন করে

খ. উগ্র স্বভাব পরিহার করে

গ. যথাসাধ্য চেষ্টা করে

ঘ. সংযমগুলোর অনুশীলন করে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জয়ন্ত প্রায়ই তার বাবার পকেট থেকে টাকা নেয়। বন্ধুদের সঙ্গে বেশি সময় কাটায়। তার কথাবার্তা ও চালচলনে অনেক পরিবর্তন দেখে তার বাবা একদিন ছেলেকে ডেকে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু জয়ন্ত তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। এভাবে সে দিনের পর দিন বন্ধুদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। ধীরে ধীরে সে আরও বড় ধরনের অপরাধের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল।

ক. ঈশ্বরের বিধান অমান্য করা কী ধরনের পাপ ?

খ. সাতটি রিপু বা পাপ-প্রবণতা বলতে কী বুঝ ?

গ. জয়ন্ত কী ধরনের কাজ করেছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জয়ন্তের কাজের ফলাফল কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও।

২. **(লেয়া, ছোয়া ও সুমন একই এলাকায় থাকে এবং একই শ্রেণিতে পড়ালেখা করে। সকালবেলায় একসঙ্গে তিন জনের দেখা।)**

লেয়া : ছোয়া কেমন আছ ?

ছোয়া : তোমার মতো খারাপ নেই। ভালোই আছি।

লেয়া : স্কুলে যাবে না আজ ? চলো একসঙ্গে যাই।

ছোয়া : তোমার মতো হেঁটে যাব নাকি ? আমি গাড়িতে যাব।

সুমন : তুমি লেয়ার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ কেন ? টাকার গরম দেখাচ্ছ ? ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দিবে।

ছোয়া : টাকার গরম দেখাব না ! টাকাই সব ! ঈশ্বর আমার কিছু করতে পারবে না।

ক. পাপ কী ?

খ. লঘু পাপ বলতে কী বোঝায় ?

গ. ছোয়া কী ধরনের পাপ করেছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছোয়া কীভাবে উক্ত পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে ? মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কারা স্বর্গরাজ্যে বা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না ?

২. মারাত্মক পাপ কাকে বলে ?

৩. সপ্তরিপুর নামগুলো লেখ ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পাপ থেকে মুক্তি লাভের উপায়গুলো লেখ।

২. পাপের ফল কী হতে পারে ? বর্ণনা কর।

৩. কীভাবে সপ্তরিপু দমন করা যায় ?

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তিদাতা যীশুর জীবন ও কাজ

ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা। তিনি ভালোবেসে তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টকে এই জগতে প্রেরণ করেছেন। যেন পুত্রের মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্তি (পরিত্রাণ) পায়। প্রভু যীশু খ্রিস্ট নিজেকে রিক্ত করলেন। দাসের স্বরূপ গ্রহণ করলেন। আকারে প্রকারে মানুষ হয়ে পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি মানুষকে মুক্তির বাণী দিলেন। নিজে নিষ্পাপ হয়েও মানুষের পাপের জন্য ক্রুশে প্রাণ উৎসর্গ করলেন। পুনরুত্থান করে আমাদেরকেও তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী করলেন ও নতুন জীবন দান করলেন। তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটাই ছিল একটি নিগূঢ় রহস্য। আমরা এই অধ্যায়ে তাঁর জীবনের রহস্যের বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করব। এছাড়া তাঁর প্রকাশ্য জীবনের আরম্ভ থেকে যেরুসালেমে প্রবেশের বিভিন্ন দিকগুলো জানব।

জনতার কাছে প্রচাররত যীশু

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- যীশুর জীবনের প্রধান রহস্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দীক্ষাগুরু যোহন কর্তৃক যীশুর দীক্ষাস্নান বর্ণনা করতে পারব।
- যীশুর দীক্ষাস্নানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি কীভাবে উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠন ও সুন্দর সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে তা বর্ণনা করতে পারব।
- গালিলেয়ায় যীশুর বাণী প্রচারের কাজ শুরুর কথা বর্ণনা করতে পারব।
- যীশুর যেরুসালেমে প্রবেশের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিষ্যদের মতো করে যীশুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হবো।

পাঠ ১: যীশুর জীবনের প্রধান প্রধান রহস্য

রহস্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যা সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে উদঘাটন করা যায় না। আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অতীত বলে রহস্য বোঝার জন্য গভীর বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যীশুর জীবন, কাজ, বাণী প্রচার, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সবকিছুর মধ্যেই গভীর রহস্য নিহিত রয়েছে। তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাই যীশু বলেন, যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্ট মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছেন। তাই তাঁর রহস্যের ক্ষুদ্রতম বিষয়টিও আমাদের মাঝে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ করে।

যীশুর দেহধারণ রহস্য: প্রভু যীশু খ্রিষ্ট তাঁর পিতার সাথে গভীর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু সময়ের পূর্ণতায় পিতা ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন মানুষের মুক্তির জন্য। তিনি ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাননি। তিনি নিজেকে একেবারে রিক্ত করেছেন। স্বর্গধাম থেকে তিনি মাটির ধরায় নেমে এসেছেন। মারীয়ার মতো একজন সাধারণ কুমারী কন্যাকে ঈশ্বর বেছে নিয়েছেন মুক্তিদাতার মা হবার জন্য। তিনি মারীয়াকে সেভাবেই প্রস্তুত করেছেন। পাপশূন্য করেই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন যেন আমাদের ত্রাণকর্তা একটি নিষ্কলঙ্ক গর্ভে জন্ম নিতে পারেন। কুমারী মারীয়া প্রথমে একটু বিব্রত হলেও নিজেকে 'প্রভুর দাসী' বলে ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিয়েছেন। মারীয়ার এই 'হ্যাঁ' বলার মধ্য দিয়েই মহান ঈশ্বর পুত্রের রূপ ধরে এই পৃথিবীতে এসেছেন। আকারে-প্রকারে মানুষ হয়ে নিজেকে একেবারে নমিত করেছেন। তাঁর এই দেহধারণের মধ্য দিয়ে তিনি দরিদ্র হয়েছেন, তাঁর দরিদ্রতায় তিনি আমাদেরকে ধনশালী করে তুলেছেন। তিনি দেহধারণ করে মানুষ হয়ে মানুষের সবকিছু নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিলেন। মানুষের জন্য মুক্তির এক সহজ-সরল পথ খুলে দিলেন। আমাদের আদি পিতামাতার পাপের ফলে যে স্বর্গসুখ আমরা হারিয়েছি, পুত্রের দেহ ধারণের মধ্য দিয়ে আমরা তা আবার ফিরে পেয়েছি। তিনি দরিদ্র বেশে এক গোশালায় জন্ম নিয়েছেন। দরিদ্র রাখালেরা ছিলেন তাঁর প্রথম সাক্ষী। তাঁরাই তাঁর জয়গানে মুখর হয়েছিলেন।

যীশুর নিস্তার রহস্য: যীশুর সম্পূর্ণ জীবনটাই পরিত্রাণের রহস্য। তিনি তাঁর প্রচারজীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন একেবারে দীন–দরিদ্র, অভাবী, দুঃখী, নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের মাঝে। এর কারণ হলো মানুষ যেন মুক্তির স্বাদ পেতে পারে; দুঃখ, শোক, ব্যথাবেদনা ও পাপের বন্ধন থেকে যেন তারা মুক্তি পেতে পারে। তবে আমাদের কাছে তাঁর পরিপূর্ণ মুক্তি আসে কালভেরি পর্বতে ক্রুশের উপর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। তিনি নির্দোষ ও নিষ্পাপ হয়েও নিজের কাঁধে আমাদের পাপ বহন করেছেন। ক্রুশীয় ঘৃণ্য মৃত্যু মেনে নিয়েছেন। তিনি সমস্ত কিছু সহ্য করেছেন। পিতার একান্ত বাধ্য হয়ে সবকিছু মাথা পেতে নিয়েছেন। তাঁর রক্তমূল্যের বিনিময়ে আমরা মুক্তি লাভ করেছি। আমরা হয়ে উঠেছি স্বাধীন মানুষ।

যীশুর অপ্রকাশ্য জীবনের রহস্য: প্রভু যীশু খ্রিষ্টের দৈনন্দিন জীবন ছিল নিতান্ত সহজ-সরল। ধর্মীয় নিয়ম-নীতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর আস্থা। তিনি পিতামাতার খুবই বাধ্য ছিলেন। তাঁর এই বাধ্যতা পিতা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাঁর মধ্যে যে ঐশ পিতার উপস্থিতি ছিল তা তিনি তাঁর পিতামাতাকে এই কথা বলে জানান, "তোমরা কি জানতে না যে, আমার পিতার গৃহেই আমাকে থাকতে হবে?" তিনি যে পিতার বিশেষ প্রেরণকাজে নিবেদিত তা তিনি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন।

যীশুর মহিমা লাভের রহস্য: প্রভু যীশুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। তিনি সমাহিত হয়েছেন এবং তিন দিন পর পুনরুত্থান করেছেন। প্রভু যীশু খ্রিষ্ট নিজে পুনরুত্থান করে আমাদেরকেও তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী করেছেন। আমাদের মধ্যেও একটা প্রত্যাশার জন্ম নিয়েছে যে, এখানে মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। আমরা একদিন খ্রিষ্টের সাথে পুনরুত্থিত হবো। কারণ যীশু নিজেই আমাদের বলেছেন যে, আমিই পুনরুত্থান, ২০২১

আমিই জীবন। যে আমাকে বিশ্বাস করবে সে অনন্ত জীবন লাভ করবে। প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেকে তাঁর অনন্ত জীবনের সহভাগী হয়ে উঠেছি। যীশুর মহিমা আমাদেরকেও পরিত্রাণের মহিমায় মহিমান্বিত করে তুলেছে।

সুতরাং, প্রভু যীশুর সমগ্র জীবনই ছিল রহস্যে ভরপুর। তাঁর দেহধারণ থেকে শুরু করে যাতনাভোগের তিক্ত সির্কা এবং পুনরুত্থানের শববস্ত্র পর্যন্ত সবকিছুই ছিল যীশুর জীবনের রহস্যগুলোর চিহ্ন। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তা উদ্‌ঘাটন করতে হয়।

পাঠ ২: যীশুর দীক্ষাস্নান

আমরা অনেকেই শিশু অবস্থায় দীক্ষাস্নান বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেছি। প্রভু যীশু বড় হয়ে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছেন। তবে প্রভু যীশুর দীক্ষাস্নান আমাদের দীক্ষাস্নান থেকে ভিন্ন রকমের ছিল। তিনি দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে মন পরিবর্তনের দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন। আমরা যে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করি সেই দীক্ষাস্নান বলতে আমরা বুঝি প্রভু যীশু খ্রিষ্ট কর্তৃক স্থাপিত ও মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত বাহ্যিক চিহ্ন বা প্রতীক। এর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা অনুগ্রহ লাভ করি। প্রভু যীশু খ্রিষ্ট নিজে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে দীক্ষাস্নান সংস্কারের একটি নতুন রূপ দান করেছেন। তা হলো জল ও আত্মায় নতুন জীবন লাভ।

প্রভু যীশু তাঁর প্রকাশ্যজীবন শুরু করেছেন জর্ডন/যর্দন নদীতে দীক্ষাগুরু যোহনের দ্বারা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। দীক্ষাগুরু যোহন মানুষকে পাপমোচনের উদ্দেশ্যে মন পরিবর্তনের আহ্বান করেন। তিনি এই বলে তাঁর মন পরিবর্তনের বাণী প্রচার করেন, তোমরা মন ফেরাও। তিনি মানুষকে মনের আঁকা-বাঁকা সমস্ত চিন্তা দূর করে সত্য ও সুন্দরের সহজ-সরল পথে চলতে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেক করগ্রাহক, ফরিসি, সাদুকি ও পাপী মানুষ মন পরিবর্তন করে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন।

একদিন যীশু নিজে দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে এলেন দীক্ষাস্নান গ্রহণ করতে। তিনি নিষ্পাপ হলেও দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছেন ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্য। যোহন প্রথমে যীশুকে দীক্ষাস্নান দিতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন যে, তাঁরই বরং যীশুর কাছে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করা উচিত। যীশু কিন্তু দমে যাননি। যীশু তাঁকে বললেন, যেন এখনকার মতো যোহন রাজি হন। অতএব যোহন যীশুকে দীক্ষাস্নান দিলেন। দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার সাথে সাথে পবিত্র আত্মা এক কপোতের আকারে যীশুর উপর নেমে এলেন। আর তখনই স্বর্গ থেকে এই বাণী শোনা গেল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা এঁর কথা শোন"। উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে তা শুনল ও দেখল। এই ঘটনাটি হলো ঈশ্বরপুত্র ও ইস্রায়েলের মশীহ বা ত্রাণকর্তারূপে যীশুর আত্মপ্রকাশের আরম্ভ।

কাজ: যীশুর দীক্ষাস্নানের ঘটনাটি অভিনয় করে দেখাও।

যীশুর দীক্ষাস্নানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

যীশু খ্রিষ্ট নিজে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে পরমেশ্বরের কষ্টভোগী সেবক হিসেবে তাঁর প্রেরণকর্ম শুরু করেছেন। তিনি পাপী মানুষের সাথে নিজেকে গণ্য করেছেন। দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে কালভেরিতে নিজের রক্ত ঝরিয়ে মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তিনি পিতার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর সেই সম্মতির প্রত্যুত্তরে পিতা ঈশ্বরও তাঁর প্রতি প্রীত আছেন বলে ঘোষণা করলেন। যীশুর দেহধারণের সময় থেকে যে আত্মা তাঁর ওপর অধিষ্ঠিত ছিল সেই একই আত্মা তাঁর ওপর এসে বিরাজ করে। আদমের পাপের ফলে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীক্ষাস্নানের ফলে আমরা পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে যাবার সুযোগ পাই। পবিত্র আত্মার অবতরণের ফলে এক নতুন সৃষ্টির সূচনা হলো।

দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে একজন খ্রিষ্টভক্ত প্রভু যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়ে জল ও আত্মায় নতুন জন্মলাভ করে। প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে সে হয়ে ওঠে পিতা ঈশ্বরের একান্ত প্রিয়জন। সে চলতে পারে জীবনের নবীনতায়,যেখানে কোনো পাপ-কালিমা নেই। এভাবে দীক্ষাস্নাত প্রত্যেক ব্যক্তিই যীশুর পবিত্রতায় বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

কাজ: দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে কী পরিবর্তন হয়, তা দলে আলোচনা কর।

পাঠ ৩: যীশুর বাণী প্রচার যাত্রার শুরু

প্রভু যীশু দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকাশ্যজীবন শুরু করেন। দীক্ষাস্নানের পরপরই প্রভু যীশু মরুপ্রান্তরে নির্জনে চল্লিশ দিন সময় কাটান। এ সময় তিনি পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হয়ে বন্যপ্রাণীদের সাথে বাস করেন। স্বর্গদূতেরা তখন তাঁর পরিচর্যা করেছেন। তিনি শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হন এবং শয়তানের উপর বিজয় ছিনিয়ে আনেন। তারপর প্রচার কাজ শুরু করার জন্য বার জন শিষ্যকে বেছে নেন।

যাঁর দ্বারা প্রভু যীশু দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন সেই দীক্ষাগুরু যোহনকে কারাগারে বন্দী করা হলে পর যীশু গালিলেয়ায় চলে এলেন। গালিলেয়াতে তিনি তাঁর প্রচারকাজ শুরু করেন। তিনি বলতেন,"সময় হয়ে এসেছে: ঐশরাজ্য এখন খুব কাছেই। তোমরা মন ফেরাও; তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর"। তাঁর প্রচারের মূল বিষয় ছিল ঐশরাজ্য এবং মন পরিবর্তন। আসলে ঐশরাজ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি পিতার বাণী মানুষকে শুনিয়েছেন।

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকে যীশুর অনুসরণ করেছেন। আবার কাউকে কাউকে তিনি বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন ঐশরাজ্যের সাক্ষী হতে। বাণীপ্রচারের শুরুতে তিনি তাঁদের গালিলেয়া সাগরের ধার থেকে আহ্বান করেছেন। তিনি একদিন সাগরের ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি সিমোন ও তার ভাই আন্দ্রিয়কে সাগরে জাল ফেলতে দেখলেন। তিনি তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর অনুসরণ করতে। আর তাঁরা তাঁর ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে যীশুর সঙ্গ নিলেন, তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। এরপর একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি জেবেদের দুই ছেলে– যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখতে পেলেন। তাঁরা নৌকায় বসে তাদের জাল সারাচ্ছিলেন। যখনই যীশু তাঁদের ডাক দিলেন তখনই তাঁরা তাঁদের পিতা জেবেদকে নৌকোয় মজুরদের সঙ্গে রেখে যীশুর সঙ্গে চললেন। এভাবে তিনি অন্যান্যদেরও ডাকলেন এবং ঐশরাজ্যের মর্মসত্য বুঝিয়ে দিলেন।

কাজ: যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা যীশুর অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের যে কোন ৫ জনের নাম লেখ।

বাণী প্রচারের তাৎপর্য

পিতার ইচ্ছা পালন ও বাস্তবায়ন করাই ছিল প্রভু যীশুর এ জগতে বাণীপ্রচারের মূল বিষয়। আর পিতার ইচ্ছা হচ্ছে মানুষকে অনন্ত মৃত্যু অর্থাৎ পাপের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা। এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যাতে যীশুর প্রচারিত ঐশজীবনের সহভাগী হতে পারে। প্রভু যীশু খ্রিষ্ট ঐশরাজ্যের প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জনমণ্ডলীই হচ্ছে খ্রিষ্টমণ্ডলী, যা এ জগতে ঐশরাজ্যের বীজ এবং সূচনা।

কাজ: তোমরা কীভাবে যীশুর পথ অনুসরণ করছ, সেই অভিজ্ঞতা দলে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৪: যীশুর যেরুসালেমে প্রবেশ

প্রভু যীশুকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়ার দিনগুলো যখন খুব কাছে এসে গিয়েছিল তখন তিনি পুণ্যনগরী যেরুসালেমে যাবার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জানতেন এই যেরুসালেমেই তাঁকে হত্যা করা হবে। তাঁর বাণীপ্রচারকালে তিনি তিনবার তাঁর শিষ্যদেরকে এই কথাটি স্মরণও করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রভু যীশু যেরুসালেমে যাত্রার মধ্য দিয়ে এই ইঙ্গিত দিলেন যে, তিনি মৃত্যুবরণ করার জন্য যেরুসালেমে যাত্রা করছেন। কারণ যেরুসালেমেই সকল প্রবক্তাদের শহীদ মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তাঁর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হবে না।

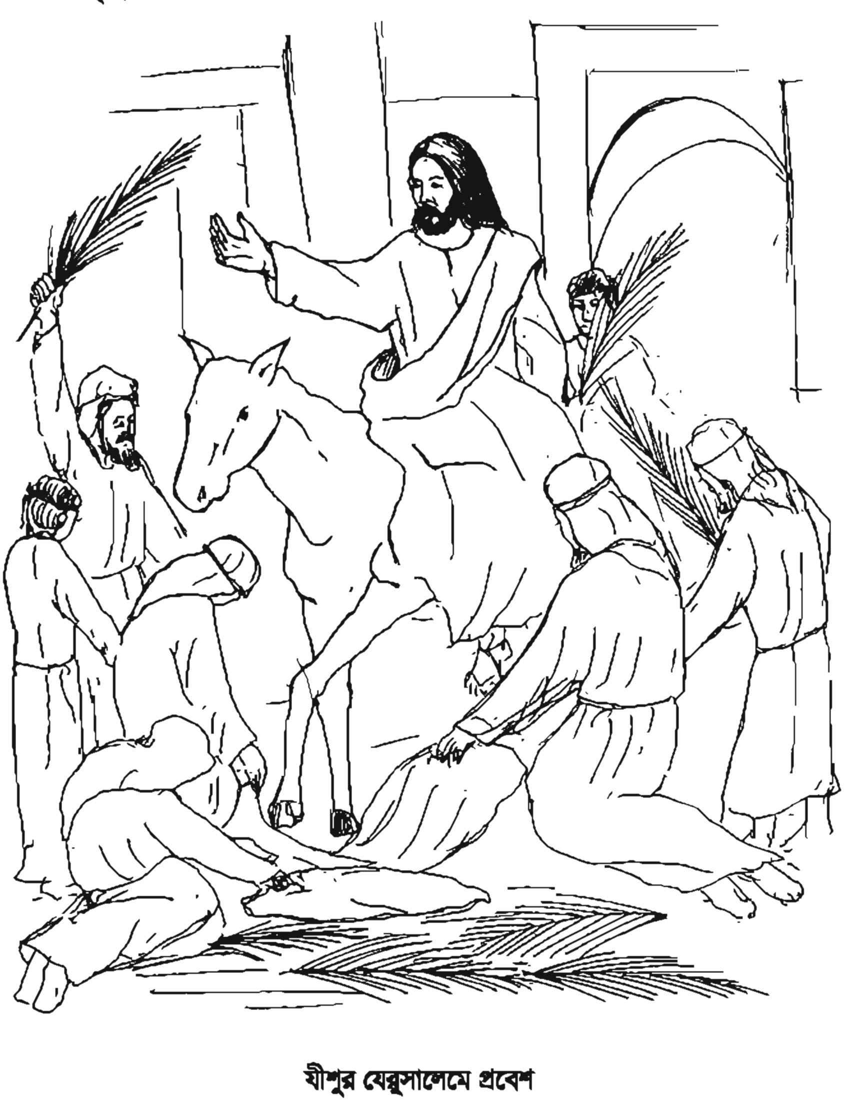

যীশুর যেরুসালেমে প্রবেশ

মহাগৌরবে যীশুর যেরুসালেমে প্রবেশ

যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যেরুসালেমের দিকে এগিয়ে আসছেন। এই সময় নিস্তার পর্বে যোগ দিতে বহু লোক যেরুসালেমে এসেছিল। তারা যখন শুনতে পেল যীশু যেরুসালেমে আসছেন তখন তাঁরা তাঁকে
২০২০ স্বাগতম জানাতে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে যীশুর শিষ্যেরা গ্রাম থেকে একটি গাধার বাচ্চা এনে তাঁর পিঠের

উপর নিজেদের গায়ের চাদর পেতে দিলেন। তারপর যীশুকে তাঁর উপর বসালেন।

বহু লোকও তখন তাদের নিজেদের গায়ের চাদর পথের উপর বিছিয়ে দিতে লাগল। কেউ কেউ আবার ডালপালা কেটে এনে পথের উপর বিছিয়ে দিলেন। আর যীশুর সামনে ও পিছনে জনতা চিৎকার করে বলতে লাগল, "জয় জয়! প্রভুর নামে যিনি আসছেন, ধন্য তিনি ধন্য। আমাদের পিতৃপুরুষ দাউদের যে রাজ্য এবার প্রতিষ্ঠিত হবে, ধন্য ধন্য সেই রাজ্য। আহা, উর্ধ্বলোকে উঠুক জয়ধ্বনি।" এভাবে জয়রবের সাথে সাথে যীশু যেরুসালেমের মন্দিরে প্রবেশ করেন।

যেরুসালেমে প্রবেশের তাৎপর্য

প্রভু যীশুকে অনেকে রাজা বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি সবসময় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপন নগরী তাঁকে পরিত্রাতারূপে কীভাবে গ্রহণ করে তা তিনি রাজার বেশে যেরুসালেমে প্রবেশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন। তিনি সাধারণ একটি গাধার পিঠে চড়ে দাউদের সন্তানরূপে যেরুসালেমে প্রবেশ করেছেন। কারণ তাঁর রাজত্ব ব্যতিক্রমধর্মী। এই রাজত্ব তিনি তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের নিস্তার রহস্যের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করবেন।

অনুসন্ধানমূলক কাজ: তপস্যাকালে কী কী ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে খ্রিষ্টভক্তরা ইস্টার বা পাস্কাপর্বের জন্য প্রস্তুত হয় এবং ইস্টারের আনন্দ কীভাবে একে অপরের সাথে সহভাগিতা করে তার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. প্রভু যীশুকে অনেকে ——————বানাতে চেয়েছিল।

২. যীশু যেরুসালেমে গিয়েছেন —————— চড়ে।

৩. ঐশরাজ্য এখন খুব ——————।

৪. প্রচারকাজ শুরু করার জন্য —————— জন শিষ্যকে বেছে নেন।

৫. যীশু —————— দ্বারা পরীক্ষিত হন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পিতা ঈশ্বর নিজেকে	▪ পরিত্রাণের রহস্য
২. যে আমাকে দেখেছে	▪ জয়গানে মুখর হয়েছিল
৩. যীশুর সম্পূর্ণ জীবনটাই	▪ প্রকাশ করেছেন
৪. রাখালেরা যীশুর	▪ স্বাধীন মানুষ
৫. আমরা হয়ে উঠেছি	▪ সে পিতাকে দেখেছে

২০২০

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যীশু বাণীপ্রচারকালে কতবার নিজ মৃত্যুর কথা বলেছেন ?

ক. দুইবার খ. তিনবার

গ. চারবার ঘ. পাঁচবার

২. যীশু দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছেন কী প্রকাশের জন্য ?

ক. ঈশ্বরের গৌরব

খ. স্বর্গদূতের মহিমা

গ. পবিত্রাত্মার মহিমা

ঘ. যোহনের গৌরব

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মফস্বল এলাকায় প্রচারকগণ সাক্রামেন্ত গ্রহণের জন্য শিশু-কিশোরদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যাতে তারা ভালোমন্দ ন্যায়-অন্যায় ও মন পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারে। পুরোহিতগণ বছরে একবার দূরবর্তী গ্রামে পালকীয় কাজে যান। তখন হিমেলও সাক্রামেন্ত গ্রহণের জন্য উৎসাহিত হলো। পরে তাকে সাক্রামেন্ত দিয়ে মণ্ডলীভুক্ত করা হলো।

৩. হিমেল উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেছে ?

ক. পাপস্বীকার

খ. কমুনিয়ন

গ. দীক্ষাস্নান

ঘ. হস্তার্পণ

৪. হিমেল উক্ত সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে লাভ করে –

i. ঈশ্বরের অনুগ্রহ

ii. নতুন জীবন

iii. মণ্ডলীর স্বীকৃতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনল একজন বাণীপ্রচারক। ছোটবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি তার মনোযোগ একটু বেশি। ধর্মীয় যে কোনো কাজে অনল সবার আগে। প্রচারকাজ করতে গিয়ে মানুষের বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন হয়। মানুষের ঘৃণা, অপমান সবই সহ্য করে তার কাজ সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ অনল খুব ভালোভাবে জানত যে ভালো কিছু করতে হলে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এমনকি আপনজনদের কাছেও অবহেলিত হতে হবে। ছোটবেলার ধর্মীয় শিক্ষা তাকে স্থির থাকতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই সে আজও ঈশ্বরের বাধ্য থেকে একজন স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠেছে।

ক. যীশুর জন্মের প্রথম সাক্ষী কারা ?

খ. যীশু কোন গোশালায় জন্ম নিয়েছেন ?

গ. অনল তার কাজে কার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনলকে কি তুমি ঈশ্বরের মহিমা লাভের উপযুক্ত বলে মনে কর ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২. প্লাসিড একজন সমাজকর্মী। সমাজের উন্নয়নের জন্য তিনি সকলের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা এলাকার সবারই জানা। একসময় তাঁরই এক বন্ধু চক্রান্ত করে তার সততা যাচাই করার জন্য প্লাসিডকে পরীক্ষা করে। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে বলে তিনি যেন সেবামূলক কাজ বন্ধ করেন। প্লাসিড তাঁর বন্ধুর কথায় কোনো গুরুত্বই দেয়নি। বরং তিনি তাঁর সেবামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করার জন্য অনেক কর্মী নিয়োগ দিলেন, যাতে তার অনুপস্থিতিতে অন্যেরা সেবাকাজ চালিয়ে নিতে পারে।

ক. যীশু কার দ্বারা দীক্ষাস্নাত হন ?

খ. একজন খ্রিষ্টভক্ত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে কী হয়ে ওঠেন ?

গ. যীশুর জীবনের কোন ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্লাসিড প্রলোভন থেকে জয়ী হয়েছেন ? বর্ণনা কর।

ঘ. যীশুর শিষ্যদের আহ্বান ও প্লাসিডের কর্মীদের নিয়োগ– এ দুইটি বিষয়ের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. যীশু কেন ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছিলেন ?

২. যীশুর মহিমা আমাদের কী করতে সাহায্য করে ?

৩. দীক্ষাগুরু যোহনের প্রচারের মূল বিষয় কী ছিল ?

৪. যীশুর দীক্ষাস্নানের সময় কোন বাণীটি শোনা গেল ?

৫. যীশু কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দীক্ষাগুরু যোহন কর্তৃক যীশুর দীক্ষাস্নানের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

২. যীশু কেন যেরুসালেমে গিয়েছিলেন ?

৩. যীশুর যেরুসালেমে প্রবেশের ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরের আহ্বানে মারীয়ার সাড়াদান

মানুষ পাপ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও মানুষের জন্য ঈশ্বরের সীমাহীন ভালোবাসা একটুও কমে যায়নি। তিনি মানুষকে কথা দিলেন যে, তিনি একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠাবেন। ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মারীয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ঈশ্বরের আহ্বানে মারীয়ার সাড়াদান আমাদের জীবনের জন্য অনুপ্রেরণাস্বরূপ। আমরা অন্তরের গভীরে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে এই অধ্যায়টি পাঠ করব এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান উপলব্ধি করতে ও সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করব।

মারীয়ার কাছে দূতের সংবাদ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলের সংবাদ দানের কথা বর্ণনা করতে পারব।
- খ্রিস্ট ও মারীয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করতে পারব।
- খ্রিস্টমণ্ডলীর রহস্যে মারীয়ার স্থান নির্ণয় করতে পারব।
- ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলতে উদ্বুদ্ধ হবো।

পাঠ ১: মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলের সংবাদ দান

মানবজাতির পতন ও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি থেকেই শুরু হয়েছে মুক্তির পরিকল্পনা। সাপের বেশ ধরে আসা শয়তানকে ঈশ্বর বলেছিলেন: "তোমার ও নারীর বংশের মধ্যে, তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে আমি এক শত্রুতা জাগিয়ে তুলব; তার বংশের মানুষ তোমার মাথায় আঘাত হানবে আর তুমি তাদের পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে।" এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে এক নারীর কথা ও তাঁর বংশের কথা উল্লেখ আছে।

মারীয়া ছিলেন নাজারেথের এক কুমারী কন্যা। জাতিতে তিনি ছিলেন ইহুদি। তাঁর বাবা ছিলেন যোয়াকিম এবং মা আন্না। জন্মের পূর্ব থেকেই মারীয়াকে তাঁর বাবা ও মা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন। আর ঈশ্বর তাঁর পুত্রের জননী হবার জন্য মারীয়াকে নিষ্পাপ অবস্থায় পৃথিবীতে এনেছিলেন।

একদিন ঈশ্বর মারীয়ার কাছে স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে পাঠালেন। মারীয়া ছিলেন যোসেফ নামক দাউদ বংশীয় একজনের বাগদত্তা বধু। স্বর্গদূত তাঁর কাছে এসে বললেন: "প্রণাম মারীয়া! পরম আশিসধন্যা তুমি! প্রভু তোমার সঙ্গেই আছেন!" এই কথা শুনে মারীয়া খুব বিচলিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, এমন সম্ভাষণের অর্থ কী? স্বর্গদূত তখন মারীয়াকে বললেন: "ভয় পেয় না, মারীয়া! তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ। শোন, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রের জন্ম দেবে। তাঁর নাম রাখবে যীশু। তিনি মহান হয়ে উঠবেন, পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। প্রভু ঈশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন। যাকোব-বংশের ওপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন; অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব।"

মারীয়া তখন দূতকে বললেন: "তা কী করে হবে? আমি যে কুমারী?" উত্তরে দূতটি বললেন: "পবিত্র আত্মা এসে তোমার ওপর অধিষ্ঠান করবেন, পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবে তুমি। তাই এই যাঁর জন্ম হবে, সেই পবিত্রজন ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচিত হবেন।. . . আর দেখ, তোমার আত্মীয় এলিজাবেথ, সে-ও বৃদ্ধবয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে। লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তাঁরই এখন ছয় মাস চলছে। কারণ ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই।!" মারীয়া তখন বললেন:"আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলছেন, আমার তাই হোক!"(লুক:১:২৬–৩৮)।

কাজ: মারীয়ার কাছে দূত-সংবাদের ঘটনাটি অভিনয় করে দেখাও। অভিনয় শেষে দূতের বন্দনা প্রার্থনাটি একসঙ্গে বল।

বাইবেলের এই অংশটুকু পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই স্বর্গদূতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মারীয়ার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাঠালেন। মুক্তিদাতার মা হবার জন্য তিনি মারীয়াকে আহ্বান জানালেন। আর মারীয়া প্রথমে বিচলিত হলেও ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন। তিনি বললেন, "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলছেন, আমার তাই হোক!"

নাজারেথের কুমারী কন্যা মারীয়া অতি সাধারণভাবেই জীবন যাপন করছিলেন। আর দশটি সাধারণ মেয়ের মতোই মারীয়া যোসেফকে নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন দেখছিলেন। কারণ যোসেফের সাথে তাঁর বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছিল। মারীয়া ও যোসেফের মধ্যে বাগ্‌দান হয়েছিল। আর ঠিক সেই সময় দূতের এই সংবাদ তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। তারপর অবিবাহিত অবস্থায় সন্তান গর্ভে ধারণ করার বিষয়টিও যে অসম্ভব তা নিয়েও মারীয়া গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিলেন। কারণ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। তিনি ছিলেন অতি পবিত্র, ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত নারী। ঈশ্বরের যে-কোনো ইচ্ছা পালনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও উন্মুক্ত। নিজেকে

তিনি ঈশ্বরের দাসী বলেছেন। স্বর্গদূত যখন তাঁকে বললেন যে ঈশ্বরের কাছে সবই সম্ভব, তখন মারীয়া তাঁর জীবনে ঈশ্বরের যে–কোনো ঘটনাই ঘটতে দিতে রাজি হলেন। এতে তাঁর কী হবে, সমাজের লোকেরা কী ভাববে বা বলবে এ ধরনের কোনো বিষয়ে তিনি চিন্তা করেননি। তাঁর পুরো জীবন দিয়ে তিনি শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করবেন এটাই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা।

কাজ: তোমার জীবনে তুমি কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন কর তা দলের সাথে সহভাগিতা কর।

পাঠ ২: খ্রিস্ট ও মারীয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

খ্রিস্টের সঙ্গে মারীয়ার সম্পর্ক কোনোক্রমেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ মারীয়া প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বর ও মুক্তিদাতার মা। আমরাও তাঁকে এভাবে স্বীকৃতি দেই ও সম্মান করি। যে কারণে খ্রিস্ট ও মারীয়ার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা যায় না, ঠিক সেই কারণেই খ্রিস্টমণ্ডলীর সঙ্গে মারীয়ার বন্ধনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মানবজাতির পরিত্রাণকাজে পুত্রের সঙ্গে মাতার একাত্মতা ছিল। এই একাত্মতা কুমারীর গর্ভে যীশুর আগমন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে।

১। **অনুগৃহীতা:** প্রভুর আগমনবার্তা ঘোষণার সময় মহাদূত গাব্রিয়েল তাঁকে 'অনুগৃহীতা' বলে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। এই বিশেষ সময় মারীয়া যেন তাঁর বিশ্বাসের গুণে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন তার জন্য 'অনুগ্রহে পূর্ণ' হওয়া খুব দরকার ছিল। মারীয়া আশিসধন্যা হয়েছেন ও তাঁর পবিত্রতা এসেছে সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টের কাছ থেকে। "খ্রিস্টের পুণ্য ফলে তিনি এক মহত্তর উপায়ে পরিত্রাণ লাভ করেছেন।"

২। **বাধ্যতা:** স্বর্গদূত মারীয়াকে বলেছিলেন যে পবিত্র আত্মার শক্তিতে তিনি একটি পুত্রের জন্ম দেবেন। বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব মনে হলেও মারীয়া বিশ্বাসপূর্ণ বাধ্যতা সহকারে তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত জানতেন যে "ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই।" বাধ্যতা ও নম্রতার কারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, "আমি প্রভুর দাসী; আপনি যা বলেছেন, আমার প্রতি তা-ই ঘটুক।" এই সম্মতিদানের মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বরপুত্রের মা হয়েছিলেন। মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঐশ ইচ্ছাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন। নিজ পুত্রের নিকট এবং তাঁর কাজে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করেছেন। হবার অবাধ্যতার ফলে মানুষ পাপে কলুষিত হয়েছিল। কিন্তু মারীয়ার বিশ্বাস ও বাধ্যতার কারণে মানুষ পাপমুক্ত হয়েছে। হবার অবাধ্যতায় পৃথিবীতে এসেছিল মৃত্যু। কিন্তু মারীয়ার বাধ্যতায় পৃথিবীতে এসেছে জীবন। তিনি হয়ে উঠেছেন জীবিতদের মাতা। স্বয়ং যীশুর সাথে যুক্ত থেকেই তিনি বাধ্যতার এই ঐশগুণ লাভ করেছেন।

৩। **মারীয়া যীশুকে জগতে এনেছেন:** যীশুর জন্য মারীয়া পুরো জীবনটাই উৎসর্গ করেছিলেন। মারীয়া যীশুকে গর্ভে ধারণ করলেন ও পৃথিবীর জন্য একজন ত্রাণকর্তাকে উপহার দিলেন। ছোট্ট যীশুকে তিনি বড় করে তুললেন, শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে সুবুদ্ধি দান করলেন। মারীয়ার জীবনের সব আনন্দ-বেদনা যীশুকে ঘিরেই। যীশুর জন্য মারীয়া সাতটি শোক পেয়েছিলেন। এই সাতটি শোক ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মারীয়া যীশুর জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তবে এই দুঃখ-শোকের মধ্য দিয়ে মারীয়ার মাতৃত্বের রূপটি আরও সুন্দর ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মা হিসেবেই মারীয়া সবসময় মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করেন। এভাবে খ্রিস্ট ও তাঁর মণ্ডলীর সাথে মারীয়ার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

৪। **মারীয়ার ঐশ মাতৃত্ব:** পবিত্র বাইবেলে মারীয়াকে 'যীশুর মাতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় এলিজাবেথ তাঁর পুত্রের জন্মের আগেই মারীয়াকে 'আমার প্রভুর মা' বলে সম্বোধন করেছেন। মারীয়ার এই ঐশ মাতৃত্বকে মণ্ডলীও স্বীকার করে নিয়েছে: মারীয়া ঈশ্বরজননী। তিনি পরমেশ্বরের পুত্র, যিনি মানুষ হয়েছেন এবং যিনি নিজেই ঈশ্বর– তাঁর জননী হয়েছেন মারীয়া। মা ও পুত্রের চিরকালীন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে যীশু ও মারীয়া আবদ্ধ।

৫। **ক্রুশের তলায় মারীয়া:** মারীয়ার সাথে খ্রিস্ট ও মণ্ডলীর একাত্মতা সবচেয়ে গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যীশুর যন্ত্রণাভোগের সময়। যীশু শত্রুদের হাতে সমর্পিত হলেন।

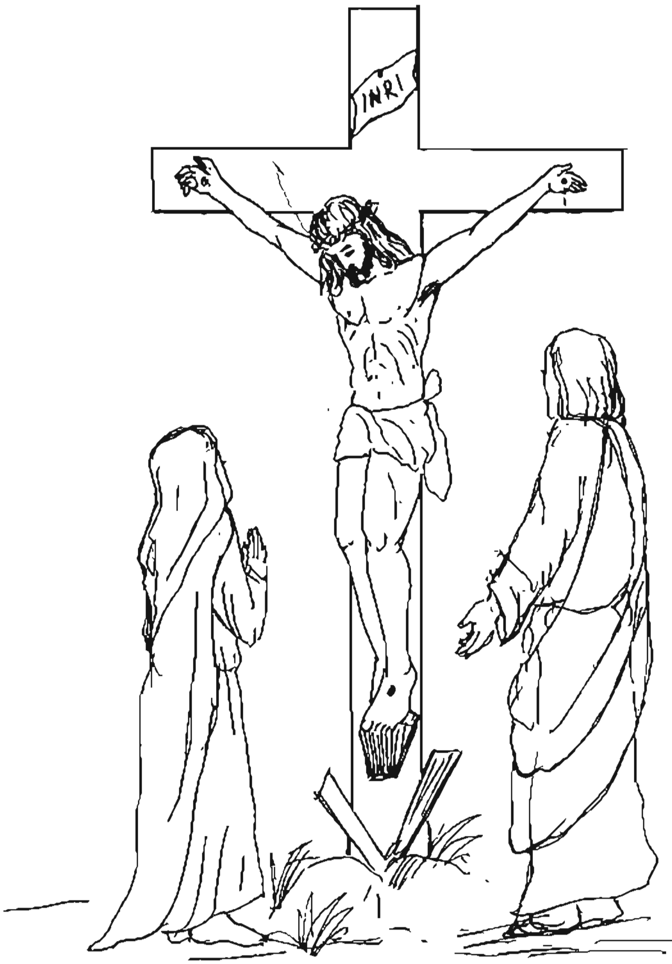

ক্রুশের তলায় মারীয়া

তাঁর বিচার হলো এবং তাঁকে ক্রুশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো । এতে মারীয়া ভীষণভাবে আঘাত পেলেন। যীশুর কাঁধে অতি ভারী ক্রুশ চাপিয়ে দেওয়া হলো। তিনি ক্রুশ কাঁধে চললেন কালভেরির পথে। মারীয়াও তাঁর সাথে চললেন। পথে তাঁর প্রিয় পুত্রের সাথে দেখা হলো। যীশু কালভেরিতে পৌঁছলে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো। মৃত্যুর

পূর্বে যীশু তিন ঘণ্টা ক্রুশীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। এই যন্ত্রণাকালে প্রায় সব শিষ্যেরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যীশুর মা মারীয়া সাহস করে ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন। মা হিসেবে সন্তানের এই মৃত্যুযন্ত্রণাকালে তাঁর উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রেরণাদায়ী।

এভাবে মারীয়া তাঁর বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় এগিয়ে গিয়েছেন। ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত পুত্রের সাথে বিশ্বস্ততায় অটল ছিলেন। ঐশ পরিকল্পনা অনুসারে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের চরম যন্ত্রণার সময় পাশে ছিলেন। তিনি তাঁর মাতৃহৃদয়ে পুত্রের যাতনার এ গভীরতা অনুভব করেছেন। মুক্তির কাজে এগিয়ে যেতে ভালোবাসাপূর্ণ সম্মতি দিয়েছেন। যীশুও মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মাকে প্রিয় শিষ্যের মা হিসেবে দান করেছিলেন। ক্রুশের তলায় মারীয়ার মাতৃত্বের এক অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। ক্রুশের তলায় মারীয়ার মাতৃত্বের তিনটি বিশেষ দিক আমরা লক্ষ করি। সেগুলো হলো: সাধারণ নারী ও মানুষ হিসেবে তাঁর মানবিক মাতৃত্ব, ঈশ্বরপুত্রের জননী হিসেবে তাঁর ঐশ মাতৃত্ব এবং বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাঁর আধ্যাত্মিক মাতৃত্ব। আমরা উপলব্ধি করতে পারি, মারীয়ার মাতৃত্বের এক চরম প্রকাশ এই ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়। যীশু নিজেও মারীয়ার কাছ থেকে শক্তি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন এই চরম যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য।

যোহনের কাছে নিজের মাকে তুলে দিয়ে মারীয়াকে তিনি বিশ্বের সকল মানুষ ও মানবজাতির মা করে দিয়েছেন। আর যোহনকে মারীয়ার পুত্র হিসেবে দান করে সমগ্র মানবজাতিকে দিয়েছেন সন্তানের অধিকার। যীশুর মৃত্যুর পূর্বে ক্রুশের তলায় মা মারীয়ার উপস্থিতিতে মানবজাতির ইতিহাসের এই অসাধারণ ঘটনাটি ঘটেছিল। আজ পর্যন্ত মারীয়া আমাদের সবার দুঃখবেদনার সময় একইভাবে আমাদের পাশে দাঁড়ান। আমাদের আশা দেন, শক্তি ও সাহস যোগান জীবনের পথে এগিয়ে যাবার জন্য। কঠিন কাজ সম্পন্ন করার ও সকল বাঁধা অতিক্রম করার জন্য উৎসাহিত করেন।

কাজ: তোমার জীবনের একটি ঘটনা সহভাগিতা কর, যখন তুমি মা মারীয়ার অনুপ্রেরণাদায়ী উপস্থিতি অনুভব করেছ।

৬। প্রার্থনার মাধ্যমে মারীয়া খ্রিস্ট ও মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত: মারীয়া তাঁর পুত্রের স্বর্গারোহণের পর প্রেরিতশিষ্যদের সাথে ছিলেন। তিনি তাঁদের সাথে একাত্ম হয়ে প্রার্থনায় রত ছিলেন। এভাবে তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করেছেন। সকলের সাথে প্রার্থনায় রত থেকে তিনি পবিত্র আত্মার অবতরণের অপেক্ষায় ছিলেন। পবিত্র আত্মার প্রভাবেই মারীয়া গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং সব সময় মারীয়াকে ঘিরে ছিলেন।

৭। মারীয়ার কুমারীত্ব: মা মারীয়া ঈশ্বরপুত্রের জননী। কিন্তু খ্রিস্টমণ্ডলী প্রথম থেকেই একথা স্বীকার করেছে যে যীশু একমাত্র পবিত্র আত্মার শক্তিতেই কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। পবিত্র বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্ম এক ঐশ্বরিক কাজ। এ বিষয়টি মানুষের পক্ষে পুরোপুরি বুঝে ওঠা কঠিন। স্বপ্নে দূত যোসেফকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে, "মারীয়ার গর্ভে যা জন্মেছে তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে।" তাছাড়াও খ্রিস্টমণ্ডলী মারীয়ার কুমারীত্বের ঐশ প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা দেখতে পেয়েছে। এ সম্পর্কে প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে লেখা ছিল: "দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে।" মারীয়ার ঈশ্বরপুত্রকে জন্মদান একটি রহস্যাবৃত সত্য। তাই মণ্ডলীর উপাসনায় মারীয়াকে সগর্বে 'চিরকুমারী' বলে ঘোষণা করা হয়।

৮। ঐশ পরিকল্পনায় মারীয়ার কুমারী মাতৃত্ব: ঈশ্বর তাঁর মুক্তি পরিকল্পনায় চেয়েছিলেন যে তাঁর পুত্র এক কুমারীর গর্ভে জন্ম নেবেন। সমগ্র মানবজাতির পক্ষে মারীয়া সেই মুক্তিদায়ী কাজকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কুমারীত্ব হলো তাঁর বিশ্বাসের চিহ্ন। তাঁর বিশ্বাসই তাঁকে তাঁর ত্রাণকর্তার জননী হতে সাহায্য করেছে। "খ্রিস্টের রক্তমাংসের দেহকে গর্ভে ধারণ করার জন্য মারীয়া ধন্যা ঠিকই, কিন্তু তিনি আরও অধিক ধন্যা, কেননা তিনি বিশ্বাসে খ্রিষ্টকে আলিঙ্গান করেছেন।" মারীয়া তাঁর মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছেন খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রতীক। খ্রিস্টের সাথে তাঁর সম্পর্ক হয়ে উঠেছে আরও দৃঢ়।

কাজ: যীশুর সাথে মারীয়ার সম্পর্ক তুমি ব্যক্তিগতভাবে কীভাবে দেখ সেই অনুভূতি ছোট দলে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৩: খ্রিষ্টমণ্ডলীর রহস্যে মারীয়ার স্থান

মারীয়া খ্রিস্টের মাতা এবং তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীরও মাতা। খ্রিস্ট ও পবিত্র আত্মার রহস্যে কুমারী মারীয়ার ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। মণ্ডলীর রহস্যেও কুমারী মারীয়ার ভূমিকাটি বিবেচনা করা হয়। মারীয়া ঈশ্বর জননী, মুক্তিদাতার জননী। তাই যীশুর সাথে জড়িত সবকিছুর সাথে তিনিও জড়িত। যীশু মণ্ডলী স্থাপন করেছেন, তিনি মণ্ডলীর মস্তক। মারীয়া যীশুর মা, তাই তিনি মণ্ডলীরও মা। মণ্ডলীর জন্মদানে মারীয়ারও ভূমিকা আছে। বিশেষভাবে মণ্ডলীর জন্মদিন, পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে যখন পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন তখন মা মারীয়া শিষ্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। আজ পর্যন্ত মারীয়া মণ্ডলীর মাতা হিসেবে সর্বদা মণ্ডলীতে উপস্থিত আছেন।

১। **ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি:** খ্রিষ্টমণ্ডলীতে মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। খ্রিষ্টমণ্ডলীর আদি থেকেই তিনি ঈশ্বরজননী বলেই সম্মানিত হয়ে আসছেন। মণ্ডলীর উপাসনায় মা মারীয়ার বিশেষ স্থান আছে। মারীয়ার পর্বগুলো পালন, রোজারী মালা প্রার্থনার প্রতি ভক্তি– এগুলো মা মারীয়ার প্রতি ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ । মণ্ডলীর ভক্তজনেরাও তাদের বিপদে–আপদে বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে থাকে। শুধু তাই নয় পৃথিবীর অনেক গির্জাঘর ও গ্রটো মা মারীয়ার নামে ও উদ্দেশ্যে নির্মিত ও নিবেদিত। মা মারীয়ার স্মরণে অনেক তীর্থস্থানও রয়েছে। যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্তজন মায়ের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা নিবেদন করতে যায়। মায়ের প্রতি বিশ্বাসের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অনেক আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে। জপমালা প্রার্থনা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রার্থনা।

২। **মারীয়া: খ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্তিমকালের প্রতিকৃতি:** ধন্যা কুমারী নিষ্কলঙ্কা। তাঁর সাথে মণ্ডলী সংযুক্ত রয়েছে বলে মণ্ডলীও পবিত্রতা অর্জন করেছে। এখানে কোনো খুঁত নেই। তথাপি এই মণ্ডলীর বিশ্বাসীগণ তাদের ব্যক্তিগত জীবনের পাপ জয় করা ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই তারা তাদের দৃষ্টি মারীয়ার প্রতি নিবন্ধ রেখে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ মারীয়ার মধ্যে খ্রিষ্টমণ্ডলী ইতোমধ্যেই সর্বপবিত্র।

৩। **মারীয়া হলেন খ্রিষ্টমণ্ডলীর বাস্তব রূপ :** মারীয়া হচ্ছেন কুমারী। তাঁর কুমারীত্ব হচ্ছে তাঁর বিশ্বাসের চিহ্ন। এই বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহের কোনো স্থানই নেই। এই বিশ্বাস ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে তাঁর অখণ্ড আত্মদানের প্রতীক। তাঁর বিশ্বাসই তাঁকে ত্রাণকর্তার জননী হতে সক্ষম করেছে। সাধু আগস্টিন বলেন, "খ্রিষ্টের রক্তমাংসের দেহকে গর্ভে ধারণ করার জন্য মারীয়া ঠিকই ধন্যা, কিন্তু তিনি আরও অধিক ধন্যা, কেননা তিনি বিশ্বাসে খ্রিষ্টকে আলিঙ্গান করেছেন।" মারীয়া একই সময়ে কুমারী ও মা হয়ে, খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রতীক হয়েছেন। খ্রিষ্টমণ্ডলী সত্যিকারে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐশবাণীকে গ্রহণ করে প্রকৃত মা হয়ে ওঠে। বাণীপ্রচার ও দীক্ষাস্নান প্রদানের মধ্য দিয়ে তিনি সন্তানদের জন্ম দেন। এই সন্তানগণ পবিত্র আত্মার শক্তিতে এবং পরমেশ্বর হতে এক নতুন এবং অবিনশ্বর জীবনে জন্মলাভ করে। তিনি নিজেই সেই কুমারী, যিনি তাঁর বরের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসে রক্ষা করেন।

কাজ: তুমি কীভাবে মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি নিবেদন করে থাক, তা দলে সহভাগিতা কর।

গান করি

আমার এ প্রাণ পরম প্রভুর মহিমা গায়।
হৃদয় ভরে মোর ত্রাণকর্তার প্রেরণায়।।
এই দীনা দাসীকে ধন্যা করিলে, অসীম আনন্দ হৃদয়ে দিলে।।
গর্বিতকে তিনি করেন লজ্জানত, শক্তিমান সম্রাট হয় পরাজিত।
দীনগণ হয় সমাজে মহান, যুগে যুগে প্রভু ন্যায়বান।।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মা মারীয়ার স্মরণে অনেক ——————— ও রয়েছে।

২. মারীয়া খ্রিষ্টের ———————এবং তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর মাতা।

৩. —————— মারীয়ার কাছে যীশুর জন্মের সংবাদ প্রদান করেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মারীয়ার মা–বাবা	▪ ছিল গভীর আস্থা ও বিশ্বাস
২. ঈশ্বরের প্রতি তাঁর	▪ সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও উন্মুক্ত
৩. গাব্রিয়েল মারীয়াকে	▪ যোয়াকিম ও আন্না
৪. ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে মারীয়া ছিলেন	▪ একটি রহস্যবৃত সত্য
৫. মারীয়ার ঈশ্বরপুত্রকে জন্মদান	▪ অনুগৃহীতা বলে সম্ভাষণ করেছেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কে মারীয়ার কাছে যীশুর জন্মের সংবাদ দিয়েছিলেন ?

ক. ঈশ্বর

খ. স্বর্গদূত

গ. পবিত্র আত্মা

ঘ. মহাদূত মিখায়েল

২. ঈশ্বর কেন মারীয়াকে বেছে নিয়েছিলেন ?

ক. মারীয়ার নম্রতার জন্য
খ. মারীয়ার প্রার্থনাশীলতার জন্য
গ. মারীয়ার পবিত্রতার জন্য
ঘ. মারীয়ার সরলতার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ফ্লোরা খুব ধার্মিক ও নীতিবান। তার একমাত্র সন্তানটি মানসিক প্রতিবন্ধী। সর্বদা ফ্লোরা তার সন্তানটির যত্ন নিতেন ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। এক সময় তার এই প্রতিবন্ধী সন্তানটি একজন প্রথম সারির চিত্রকর হয়। দেশ-বিদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে।

৩। ফ্লোরার মধ্যে কুমারী মারীয়ার যে গুণটি প্রকাশ পায় তা হলো ঈশ্বরের প্রতি –

ক. নির্ভরশীলতা খ. গভীর বিশ্বাস
গ. ভালোবাসা ঘ. ভক্তি

৪. ফ্লোরার এই চারিত্রিক গুণ মানুষকে দিতে পারে –

i. ভালোবাসা
ii. পৃথিবীতে শান্তি
iii. পাপ থেকে মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. iii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শান্তা সপ্তম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। সে ধার্মিক, সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। ইস্টার উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পাশের মাঠে অনুষ্ঠান হয়, এতে দায়িত্ব পড়ে শান্তার। অনুষ্ঠানের দিনে কিছু বখাটে ছেলে অনুষ্ঠানটিকে স্থগিত করার জন্য গোলযোগ করে। অনেক অংশগ্রহণকারী পালিয়ে যায়। শান্তা কিন্তু প্রধান শিক্ষকের নির্দেশের কথা চিন্তা করে অনুষ্ঠানটির পর্ব চালিয়ে যায়। এ সময় তার পাশে থেকে বাংলা শিক্ষক তাকে সহযোগিতা করেন, সাহস দেন। এই সময় শান্তার কুমারী মারীয়ার কথা মনে পড়ে।

ক. কুমারী মারীয়ার জীবন যাপন কেমন ছিল?

খ. আমরা কুমারী মারীয়ার প্রতি কীভাবে ভক্তি প্রদর্শন করতে পারি?

গ. শান্তার চরিত্রে কুমারী মারীয়ার কোন গুণটি পরিলক্ষিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলা শিক্ষকের ভূমিকার কারণে শান্তার এই সময়ে মারীয়ার কথা মনে হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মারীয়া জাতিতে কী ছিলেন?

২. কুমারী কন্যা মারীয়া কেমন জীবনযাপন করেছিলেন?

৩. ক্রুশের তলায় মারীয়ার কী লক্ষ্য করি?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাধ্যতা মারীয়ার বিশেষ গুণ–আলোচনা কর।

২. 'মারীয়া আমাদের আশা দেন, শক্তি দেন'– বিশ্লেষণ কর।

৩. 'খ্রিস্টমণ্ডলীর অন্তিমকালের প্রতিকৃতি' –আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য

আমরা পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনেক আশ্চর্য ঘটনার কথা জানি। এই কাজগুলো তিনি তাঁর প্রচারজীবনে করেছেন। এই আশ্চর্য কাজগুলোর মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। এগুলো হলো তাঁর ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রকাশ। লোকেরা এই কাজগুলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেত। কারণ তারা এধরনের কাজ এর আগে কখনো দেখেনি। এই অধ্যায়ে আমরা প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজসমূহের কথা চিন্তা ও ধ্যান করে যীশুর ওপর আমাদের আস্থা আরও গভীর করে তুলব।

নিরাময়কারী যীশু

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- যীশুর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের প্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- অপদূতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের প্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- যীশুর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখব ও মন্দতার প্রভাব থেকে দূরে থাকব।

পাঠ – ১: যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য

আগে আমরা মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারে প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজগুলোর কথা জেনেছি। আমরা খ্রিস্টের আশ্চর্য কাজের একটি তালিকা দেখতে পেয়েছি। এ আশ্চর্য কাজগুলোর মধ্য দিয়ে যীশু খ্রিষ্ট তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। এ শক্তি বা ক্ষমতা মন্দতা বা অপশক্তির বিরুদ্ধে। মন্দতার বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই নতুন রাজ্যই হলো ঐশরাজ্য।

ঐশরাজ্য কী

আমরা রাজ্য বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডকে বুঝে থাকি যেখানে শাসনকর্তা ও প্রজা আছে। কিন্তু ঐশরাজ্য জাগতিক কোনো রাজ্যের মতো নয়। এটি হলো ঈশ্বরের রাজ্য যেখানে কোনো পাপ বা মন্দতা নেই; বরং আছে ন্যায্যতা, শান্তি, ভালোবাসা, ক্ষমা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণগুলো। যেখানেই বা যে -কোনো ব্যক্তির মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়, সেখানেই ঐশরাজ্য বিরাজমান অর্থাৎ ঈশ্বর বিরাজমান। কাজেই বলা যায়, যেখানে ঈশ্বরের কর্মগুলো সাধিত হয় ও যারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলে তাদের মধ্যে ঐশরাজ্য বিরাজমান। এটি বাইবেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন– উভয় নিয়মেই পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মে ঐশরাজ্যের আগমনের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং তা ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রভু যীশুর এই প্রকাশ তাঁর জীবন, তাঁর কথা ও তাঁর আশ্চর্য কাজ দ্বারা সাধিত হয়েছে। এই রাজ্য শুধু খ্রিষ্টানদের কাছে নয় বরং সমগ্র মানবজাতির কাছে ঘোষণা করা হয়েছে। এই জগতে খ্রিষ্টমণ্ডলী হলো ঐশরাজ্যের বীজ বা সূচনা। মণ্ডলী সব সময় পরিপক্বতার দিকে এগিয়ে চলেছে যার মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের পরিপূর্ণতা আসবে।

কাজ: পার্থিব রাজ্য ও ঐশরাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো পাশাপাশি দুইটি কলামে লেখ।

ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রভু যীশুর আহ্বান

প্রভু যীশু তাঁর প্রচারজীবন শুরু করেন ঐশরাজ্যে প্রবেশের আহ্বান জানিয়ে। দীক্ষাগুরু যোহন কারাগারে বন্দী হওয়ার পর তিনি তাঁর সুসমাচার এই বলে ঘোষণা করেন, সময় পূর্ণ হয়েছে, ঐশরাজ্য এখন খুব কাছে এসে গেছে। তোমরা মন পরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর। প্রভু যীশু জগতে এসেছেন তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করে এই জগতে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর পিতার ইচ্ছাই হচ্ছে, মানুষকে জীবন দান করা, যাতে মানুষ তাঁর ঐশ জীবন সহভাগিতা করতে পারে। এই কারণে তিনি তাঁর চারপাশের মানুষকে সমবেত করেন। তিনি তাঁর বাণীর দ্বারা, ঐশরাজ্যের প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন চিহ্ন ও তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে মানুষকে তাঁর চারপাশে সমবেত হতে আহ্বান করেন। সর্বোপরি প্রভু যীশু তাঁর ক্রুশ মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঐশরাজ্যের প্রকাশকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যান।

প্রভু যীশু তাঁর ঐশরাজ্যে সবাইকে আহ্বান করেন। যদিও ঐশরাজ্যের কথা প্রথমে ঈশ্বরের প্রিয় জাতি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে, তথাপি তা সকল জাতির, সকল মানুষের জন্য। সবাই এই ঐশরাজ্যের নাগরিক হতে আহূত।

যদিও ঐশরাজ্য সবার জন্য তথাপি এই রাজ্যে প্রবেশের বা এর নাগরিক হওয়ার অগ্রাধিকার পাবে দরিদ্র ও বিনম্ররা। যীশু নিজেই বলেছেন যারা অন্তরে দীন, ধন্য তারা কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। তাঁরা তাঁর বাণী বিনম্র অন্তরে শোনে, গ্রহণ করে ও সে অনুসারে জীবন যাপন করে। ঐশরাজ্যের মর্মসত্য জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে নিতান্ত দীনতম ও ক্ষুদ্রতমদের কাছে। প্রভু যীশু তাঁর

পার্থিব জীবনে দীনদরিদ্রদের পক্ষ সমর্থন করেছেন, তাদের সাথে থেকেছেন, তাদের ভালোবেসে তাদের সমব্যথী হয়েছেন। সেই কারণে তিনি ঐশরাজ্যে প্রবেশের পূর্বশর্ত হিসেবে ভালোবাসাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

তথাপি ঐশরাজ্যের নাগরিক হওয়ার জন্য যীশু ঐশরাজ্যকে একটি ভোজসভার সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর এই ভোজসভায় তিনি পাপীদের নিমন্ত্রণ করেন। কারণ তিনি তো ধার্মিকদের জন্য এই জগতে আসেননি, এসেছেন পাপীদের আহ্বান করতে। মন পরিবর্তন হলো ঐশরাজ্যে প্রবেশের পথ। তাই একজন পাপীর মন পরিবর্তনে ঐশরাজ্যে কতই-না আনন্দ হয়!

ঐশরাজ্যের প্রতীকসমূহ

ঐশরাজ্যের রহস্য খুবই গভীর। এই কারণে যীশু খ্রিস্ট ঐশরাজ্যের রহস্যকে বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ও উপমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যেমন,

ক) যীশু ঐশরাজ্যকে সর্ষে বীজের সাথে তুলনা করেছেন। যীশুর অঞ্চলের সর্ষে গাছ অনেক বড়। বীজ হিসেবে তা খুবই ছোট। কিন্তু যখন চারা গজায় ও পূর্ণাঙ্গ গাছে পরিণত হয় তখন কিন্তু অন্য সব গাছ সে ছাড়িয়ে যায়। পাখিরাও এসে তাতে বাসা বাঁধতে পারে।

খ) ঐশরাজ্যকে যীশু খামিরের সাথেও তুলনা করেছেন। খামির ততক্ষণ পর্যন্ত মাখাতে হয় যতক্ষণ- না তা গেঁজে ওঠে।

ঐশরাজ্য একটি বৃক্ষের মতো

গ) যীশু ঐশরাজ্যকে আবার লুকিয়ে রাখা কোনো জমিতে গুপ্তধনের সাথে তুলনা করেছেন। কোনো লোক তা খুঁজে পেয়ে মনের আনন্দে গিয়ে তার যা-কিছু রয়েছে তা বিক্রি করে সেই জমিটা কিনে ফেলে।

যীশু তাঁর বিভিন্ন উপমার মধ্য দিয়ে সবাইকে ঐশরাজ্যে প্রবেশের আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তবে তা গ্রহণ করার জন্য প্রকৃত সিদ্ধান্ত আমাদের। ঐশরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের কিছু ছাড়তে হবে এবং তার বাণী অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে।

কাজ: শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা কীভাবে ঐশরাজ্যের নাগরিক হতে পারি? দলে আলোচনা কর।

পাঠ – ২: আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের প্রকাশ

ঐশরাজ্যের বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্য যীশু খ্রিষ্ট তাঁর বাণীতে নানা উপমা ব্যবহার করেছেন। ঐশরাজ্যের পূর্ণতা ও প্রকাশের জন্য তিনি বিভিন্ন আশ্চর্য বা অলৌকিক কাজগুলোকে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর অলৌকিক কাজগুলোর মধ্য দিয়ে এই সত্য প্রকাশিত হয় যে তিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন। এই কাজগুলো তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস আরও গভীর করতে সহায়তা করে। তাঁর এইসকল আশ্চর্য কাজ তাঁর ঐশশক্তি ও ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। এই জগতে ঐশরাজ্যের আগমনের অর্থ হচ্ছে মন্দতা বা শয়তানের পরাজয়। যীশু অপদূত তাড়ানোর মধ্য দিয়ে মানুষকে মন্দ আত্মার প্রভাব থেকে মুক্ত করেছেন। মন্দ আত্মার বিরুদ্ধে জয়লাভ প্রভু যীশু বিজয়ের পূর্বাভাস ঘোষণা করেছে। প্রভু যীশুর ক্রুশে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

কাজ: প্রভু যীশুর একটি আশ্চর্য কাজ বেছে নাও। এর মধ্য দিয়ে কীভাবে ঐশরাজ্যের প্রকাশ ঘটে এবং কীভাবে যীশুর অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা প্রকাশ পায় তা খাতায় লেখ।

ঐশরাজ্যের চাবি

ক্ষমতার বাহ্যিক চিহ্ন হলো চাবি। আমরা জানি, ঘর বা প্রতিষ্ঠানের চাবির দায়িত্ব যাকে–তাকে দেওয়া হয় না। যার সেই দায়িত্বজ্ঞান রয়েছে বা যে তা বহন করতে পারবে তাকেই সে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

প্রভু যীশু তার প্রচার জীবনে বারজন শিষ্যকে মনোনীত করেছেন যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকেন এবং তাঁর প্রেরণকর্মে অংশগ্রহণ করেন। বারোজনের অন্যতম ছিলেন পিতর, যাঁকে তিনি পাথর বলে অভিহিত করেছেন এবং এই পাথরের ভিতের উপর তাঁর মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি তাঁর হাতে ঐশরাজ্যের চাবি তুলে দিয়েছেন। পৃথিবীতে তিনি যা মুক্ত করবেন, স্বর্গেও তা মুক্ত করা হবে। আর পৃথিবীতে তিনি যা-কিছু ধরে রাখবেন তা স্বর্গেও ধরে রাখা হবে। প্রভু যীশু তাঁর মেষদের পালন করার দায়িত্বও পিতরকে দিলেন। পিতরের হাতে ঐশরাজ্যের চাবি প্রদান করা ও তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে পোপের দায়িত্ব পালনের কাজ ঐশরাজ্যের উপস্থিতির চিহ্নই আমাদের কাছে আজও প্রকাশ করে।

পাঠ ৩: অপদূতগ্রস্তকে সুস্থতা দান

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুইটি দিকেরই প্রভাব রয়েছে। কখনো কখনো ভালো শক্তিটা প্রবল হয় আবার কখনো কখনো প্রবল হয়ে উঠে মন্দ শক্তিটা। ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীতে শুভশক্তি ও অপশক্তি– এই দুইটিরই প্রভাব রয়েছে। কখনো কখনো আমরা দেখি শুভশক্তি খুব জোরদার ভূমিকা পালন করছে, আবার কখনো কখনো দেখি অপশক্তিটা যেন সব দখল করে নিয়েছে। মানুষ তার শুভশক্তি বা ভালো শক্তির গুণে পৃথিবী আরও সুন্দর করতে পারে। আবার মানুষই তার অপশক্তি বা মন্দ শক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীটা ধ্বংস করতে পারে। মন্দ শক্তির ধারক ও বাহক হলো শয়তান। এই মন্দ শক্তি পৃথিবীতে আদি থেকেই বিদ্যমান ছিল। যীশু অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে পরাজিত করেছেন। আজও মানুষের মধ্যে শুভ ও অপশক্তির মধ্যে লড়াই চলছে।

কাজ: বাস্তব জগতে কোথায় কোথায় মন্দ শক্তি সক্রিয় এবং কী কী উপায়ে মন্দ শক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায় দলে তার একটা তালিকা তৈরি কর।

দূত ও অপদূত

প্রভু যীশু খ্রিষ্ট অনেক অপদূত বিতাড়িত করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে মন্দের ওপর তাঁর জয়লাভের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। বাইবেলে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট কর্তৃক অপদূত বিতাড়নের বিষয়ে আলোচনার পূর্বে দূত ও অপদূত সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমরা জানি, দূতদের শুধু আত্মা আছে কিন্তু তাদের শরীর নেই। স্বর্গে চিরকাল ঈশ্বরের আরাধনা ও সেবা করতে ও তাঁর দর্শনসুখ ভোগ করতে ঈশ্বর দেবদূতদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। ঈশ্বর তাঁর প্রয়োজনে তাঁর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য দূতদের ব্যবহার করেছেন। যেমন যীশুর জন্মসংবাদ দেওয়ার জন্য মহাদূত গাব্রিয়েলকে প্রেরণ করেছেন। যীশুর জন্মের সংবাদ রাখালদের কাছে দেওয়ার জন্য দূতদের পাঠিয়েছেন। যীশুর শূন্য কবরে দূতেরা বসে ছিলেন এবং শিষ্যদের কাছে যীশুর পুনরুত্থানের বার্তা শুনিয়েছেন। এছাড়া আমাদের রক্ষা করার জন্যও ঈশ্বর রক্ষীদূতদের নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা প্রতিনিয়ত আমাদের বন্ধু ও রক্ষাকর্তা হিসেবে রক্ষা করে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে অপদূতদেরও শুধু আত্মা আছে, তাদের কোনো শরীর নেই। তারাও অনেক শক্তিশালী কিন্তু তাদের শক্তি সীমাহীন নয়। ঈশ্বরের রাজ্যগঠন প্রতিহত করাই অপদূতদের প্রধান কাজ। অপদূতেরা এই জগতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তির কাছে তা কিছুই নয়। একজন মানুষ মন্দ আত্মার দ্বারা তাড়িত হয় যখন সে শয়তানের শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই জগতে শয়তানের কাজ বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। এমনও হতে পারে যে একজন লোক নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও শয়তানের হাতিয়ার হয়ে পড়ে।

কাজ: দূত ও অপদূতদের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় কর।

যীশু অপদূত তাড়ান

বাইবেলের বিভিন্ন মঙ্গলসমাচার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রভু যীশু খ্রিষ্ট আট বার অপদূতগ্রস্ত লোককে নিরাময় করেছেন। নিম্নে এর তালিকা তুলে ধরা হলো:

১। অপদূতে পাওয়া অন্ধ ও বোবা লোকটি (মথি ১২: ২২–২৮; মার্ক ৩:২২–২৭; লুক ১১:১৪–২৩)
২। অপদূতে পাওয়া কানানীয় স্ত্রীলোকের মেয়েটি (মথি ১৫: ২১–২৮; মার্ক ৭:২৪–৩০)
৩। অপদূতে পাওয়া বোবা লোকটি (মথি ৯:৩২–৩৩; লুক ১১:১৪–১৫)
৪। অপদূতে পাওয়া মৃগীরোগী ছেলেটি (১৭:১৪–২০; মার্ক ১৪–২৯; লুক ৯:৩৭–৪৩)।
৫। অপদূতে পাওয়া গেরাসেনীয় লোকটি (মথি ৮:২৮–৩৪; মার্ক ৫:১–২০; লুক ৮:২৬–৩৯)।
৬। কাফার্নাউম/কফরনাহুম সমাজগৃহে অপদূতে পাওয়া একজন লোক (মথি ৭:২৮–২৯; মার্ক ১:২৩–২৮; লুক ৪:৩১– ৩৭)।
৭। মাগ্দালার মারীয়া (মার্ক ১৬:৯; যোহন ২০: ১১–১৮)।
৮। অপদূতে পাওয়া নুয়ে পড়া স্ত্রীলোকটি (লুক ১৩:১০–১৭)।

কাজ: যীশু অপদূতগ্রস্ত লোকদের সুস্থ করার ঘটনাগুলোর মধ্য থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অভিনয় করে দেখাবে।

ঐশ আত্মার শক্তিতেই শয়তানের শক্তি নাশ

উপরে উল্লিখিত তালিকার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভু যীশু খ্রিষ্ট অনেক অপদূতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করেছেন। একবার প্রভু যীশুর কাছে অপদূতে পাওয়া একটি লোককে আনা হলো। লোকটি বোবা ও অন্ধ ছিল। যীশু লোকটিকে সুস্থ করে তুললেন। লোকটি যে সঙ্গে সঙ্গে কথা বলার ও দেখার শক্তি ফিরে পেয়েছে তা দেখে উপস্থিত সকলে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা সকলে যীশুর জয়ধ্বনি করতে লাগল। কিন্তু ফরিসিরা তাতে খুশি না- হয়ে বলতে লাগল যীশু নাকি অপদূতরাজ বেয়েলজেবুলের শক্তিতে অপদূত তাড়িয়ে বেড়ান। যীশু তাদের মনোভাব জানতেন। তাই তিনি তাদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, বিবাদে বিভক্ত রাজ্য খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। ঠিক তেমনি শয়তান নিজে যদি শয়তানকে তাড়িয়ে বেড়ায় তাহলে শয়তানেরা নিজেদের মধ্যে নিজেরাই বিবাদে বিভক্ত হয়ে যায়। তাহলে সে রাজ্য বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। তিনি ফরিসিদের আরও জিজ্ঞেস করেন, তাদের শিষ্যরা যখন অপদূত তাড়ায় তখন কার শক্তিতে তা করে? সেটা নিশ্চয় শয়তানের শক্তিতে নয়! তারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তাই প্রভু যীশুও ফরিসিদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি। আমরা জানি, প্রভু যীশু স্বয়ং পরমাত্মার শক্তিতে অপদূত তাড়ান এবং এর মধ্য দিয়ে যে মানুষের মাঝে ঐশরাজ্যের প্রকাশ করে চলছেন তারই ইঙ্গিত তিনি তাদের দান করেন।

কাজেই দেখা যায়, প্রভু যীশু খ্রিষ্ট সমস্ত মন্দতার ওপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছেন স্বয়ং পরমপিতার কাছ থেকে পাওয়া শক্তির মধ্য দিয়ে। তিনি মন্দতাকে নির্মূল করতে এ জগতে আসেননি বরং এসেছেন যেন মানুষ মন্দতার দাসে পরিণত না-হয়। মানুষ যেন মন্দতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পরিত্রাণ বা মুক্তির স্বাদ লাভ করতে পারে এ জগতে ঐশরাজ্য প্রসারিত করার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। প্রভু যীশুর মধ্য দিয়েই আমরা ঐশরাজ্যের সন্ধান পেয়েছি।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মন্দশক্তির ধারক ও বাহক হলো ——————।

২. লোকটি বোবা ও —————— ছিল।

৩. সকলে যীশুর —————— করতে লাগল।

৪. —————— হলো ঐশরাজ্যে প্রবেশের পথ।

৫. একজন পাপী মন ফিরালে ঐশরাজ্যে কতই-না —————— হয়।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সবাই ঐশরাজ্যের	▪ দরিদ্র ও বিনম্ররা
২. প্রভু যীশু জগতে এসেছেন	▪ জীবন যাপন করতে হবে
৩. ঐশরাজ্যের নাগরিক হওয়ার অগ্রাধিকার পাবে	▪ নাগরিক হতে আহূত
৪. ঐশরাজ্য যেন একটি	▪ পিতার ইচ্ছা পালন করতে
৫. যীশুর বাণী অনুসারে	▪ সর্ষে বীজের মতো

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জগতে ঐশরাজ্যের অর্থ কী ?
  ক. যীশুর পরাজয়
  খ. শিষ্যদের পরাজয়
  গ. শয়তানের পরাজয়
  ঘ. মারীয়ার পরাজয়

২. কী কারণে ঈশ্বর ঐশরাজ্যের রহস্য প্রকাশ করেছেন ?
  ক. ন্যায়পরায়ণতার জন্য
  খ. মন পরিবর্তনের জন্য
  গ. ধার্মিকতার জন্য
  ঘ. সত্যবাদিতার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

কণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করে আসছেন। বয়সের কারণে তার পক্ষে প্রতিষ্ঠানের কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি মনে করেন, সহকর্মীদের মধ্যে কমল এ কাজটি করার উপযুক্ত। কমল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের পাশাপাশি গরিব-দুঃখীদের সেবায় নিয়োজিত।

৩. কমলের মধ্যে পিতরের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ?
  ক. সেবাপরায়ণতা
  খ. মানবতা
  গ. সহযোগিতা
  ঘ. দায়িত্বশীলতা

৪. কমলের সাথে পিতরের কাজের বৈসাদৃশ্য হলো –
  i. আর্ত-পীড়িতের সেবা
  ii. বাণী প্রচার
  iii. আশ্চর্য কাজ

নিচের কোনটি সঠিক ?

  ক. i ও ii   খ. i ও iii
  গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মাইকেল মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে গিয়ে দেখতে পেল দেশটি খুব সুশৃঙ্খল। রাজ্যটির প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সবই পরিকল্পিত বলে মনে করল। রাজার পরিচালনায় রাজ্যের জনগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে। যে কোনো সমস্যা বা অসুবিধায় রাজা তার জনগণের পাশে থেকে যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছেন। জনগণও রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজাকে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে।

ক. কারা ঐশরাজ্যের নাগরিক হতে আহূত ?

খ. ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে হলে আমাদের কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে ?

গ. মাইকেলের দেখা রাজ্যটির মধ্যে ঐশরাজ্যের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাইকেলের দেখা রাজ্য ও তোমার পাঠ্যপুস্তকের উল্লেখিত রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

২. বীনা ও রিটা দুইজনই মেধাবী এবং ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। পড়াশুনার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। কিছুদিন পর দেখা গেল বীনা একটু অন্যরকম আচরণ করতে শুরু করল। সে নেশাগ্রস্ত বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করতে করতে নিজেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়াশুনায় অবহেলা করতে শুরু করে। সে চাচ্ছে সৎপথে ফিরে আসতে, কিন্তু পারছে না। বীনার মধ্যে সৎ ও অসৎ শক্তির যুন্ধ চলছে।

ক. আমাদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর কাদের নিযুক্ত করেছেন ?

খ. কী কারণে ঈশ্বর দেবদূতদের সৃষ্টি করেছেন ?

গ. কোন শক্তির প্রভাব বীনার মধ্যে বিদ্যমান– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'প্রভু যীশুর পথই বীনাকে তার অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে'–উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে যীশুর কোন দিকটি প্রকাশ পায় ?

২. ঐশরাজ্য বলতে কী বুঝ ?

৩. ঐশরাজ্যের রহস্যসমূহ কীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ভালো-মন্দ শক্তিসমূহের পার্থক্য নির্ণয় কর।

২. ঐশরাজ্য বোঝাতে যীশু কী ধরনের উপমা ব্যবহার করেছেন সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. যীশু কর্তৃক অপদূত বিতাড়নের তিনটি ঘটনার নাম উল্লেখ করে যে কোনো একটি ঘটনা বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

খ্রিস্টমণ্ডলী এক, পবিত্র ও প্রৈরিতিক

খ্রিস্টমণ্ডলীর একজন সক্রিয় সদস্যের খ্রিস্টমণ্ডলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। আমাদের ভালো করে জানা দরকার যে, বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত থাকলেও খ্রিস্টমণ্ডলী মূলত এক ও সার্বজনীন। কারণ খ্রিস্ট নিজেই এটি স্থাপন করেছেন। তিনি ঈশ্বর। তিনি সকল পবিত্রতার উৎস। তাই মণ্ডলী পবিত্র। খ্রিস্ট তাঁর প্রেরিতশিষ্যদেরকে সারা জগতের সকল মানুষের কাছে বাণীপ্রচার করতে প্রেরণ করেছেন। তাই মণ্ডলী প্রৈরিতিক। কাজেই এক এবং পবিত্র খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমরা সকলেই প্রেরণকর্মী। আমাদের সকলকেই এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। এই কারণে মণ্ডলী সম্পর্কে আমাদের আরও উত্তমরূপে জানা দরকার।

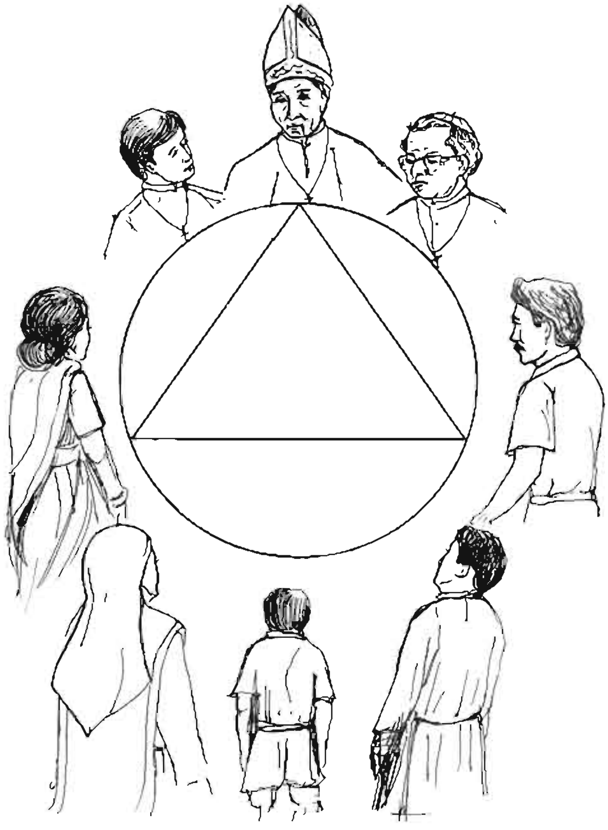

খ্রিস্টমণ্ডলীতে আমরা সকলে এক

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- খ্রিস্টমণ্ডলী বিশ্বজুড়ে 'এক' ও সার্বজনীন– এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে পারব।
- খ্রিস্টমণ্ডলীর পবিত্রতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রৈরিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখার লক্ষ্যে খ্রিস্টমণ্ডলীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- ঐক্য, পবিত্রতা ও প্রৈরিতিক সেবা কাজের মনোভাব নিয়ে জীবন যাপন করব।

পাঠ ১: খ্রিস্টমণ্ডলী এক

আমাদের প্রত্যেকের চেহারা,আচার-আচরণ, কথা বলার ধরন, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাথে অন্য এক ব্যক্তির কিছু কিছু মিল দেখা গেলেও পুরোপুরি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। একজন থেকে অন্যজন আলাদা হলেও আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা সাধারণ মিল আছে। মিলটা হলো এই যে, আমরা প্রত্যেকেই মানুষ। আমাদের সবার মধ্যেই রক্ত-মাংস আছে। আমাদের সবারই হাত-পা, নাক-কান, চোখমুখ ইত্যাদি আছে। আমরা সকলেই বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকি। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এক গ্লাস পানিকে আমরা তরল অবস্থায় দেখি, আবার দেখি বরফ হলে জমাটবাঁধা অবস্থায়। একই পানি গরম করে বাষ্প করে উড়িয়েও দিতে পারি। কাজেই পানিকে তরল, কঠিন ও বাষ্প-এই তিন অবস্থায় দেখলেও তিনটাই পানি। একইভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে আকারগত বা বৈশিষ্ট্যগত কিছু ভিন্নতা থাকলেও খ্রিস্টমণ্ডলী হিসেবে আমরা সবাই এক।

মানবজাতিকে তাঁর সাথে পুনর্মিলন এবং মানুষের সাথে মানুষের একতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন। খ্রিস্ট চেয়েছেন, তিনি ও পিতা যেমন এক তেমনি সকল মানুষ যেন এক হয়। সকলেই যেন একই খ্রিস্টীয় মিলনবন্ধন ও বিশ্বাসে একতাবদ্ধ থাকতে পারে। একতাবদ্ধ থাকার মধ্য দিয়েই খ্রিস্টমণ্ডলীর সকলেই যেন মণ্ডলীকে প্রসারিত করার কাজে অংশগ্রহণ করে।

কাজ: বিভিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দলের সদস্যের মধ্যে ঐক্য বা মিল গড়ে তোলার জন্য কী কী প্রয়োজন তা দলে আলোচনার মাধ্যমে লেখ ও উপস্থাপন কর।

আমরা দলীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখলাম কোনো একটি দলের সদস্যদের একতাবদ্ধ থাকার জন্য কোন্ বিষয়গুলো বেশি প্রয়োজন। একইভাবে খ্রিস্টমণ্ডলী শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এক। এই একতা যুগে যুগে বিরাজ করবে।

নিম্নলিখিত কারণে খ্রিস্টমণ্ডলী এক:

১। **প্রতিষ্ঠাতা:** খ্রিস্টমণ্ডলী তার একমাত্র প্রতিষ্ঠাতার কারণে এক। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর সূচনা। প্রভু যীশু মণ্ডলীর কর্ণধার। তিনি এই মণ্ডলীকে পরিচালনার জন্য শক্তি, সাহস ও মনোবল প্রতিনিয়ত দান করছেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও দিকনির্দেশনায় আমরা সবাই একতাবদ্ধ। তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছাই মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে পূরণ করেছেন। গড়ে তুলেছেন এক পবিত্র জনসমাজ।

২। **আত্মা:** খ্রিস্টমণ্ডলী তাঁর আত্মার কারণে এক। প্রভু যীশু খ্রিস্ট পঞ্চাশত্তমী দিনে তাঁর মণ্ডলীর ওপর আত্মাকে দান করেছেন। এক আত্মার কারণেই মণ্ডলীর সূচনা থেকে জগতের শেষ অবধি মণ্ডলী একতার সন্ধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং হবে। একই আত্মার আবেশে আবিষ্ট হয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীতে আত্মিকভাবে সবাই একই মণ্ডলীর অঙ্গাপ্রতঙ্গা।

৩। **ভালোবাসা:** খ্রিস্টমণ্ডলী তাঁর ভালোবাসার কারণে এক। পিতা-ঈশ্বর ও পুত্র-ঈশ্বরের ভালোবাসার মধ্য দিয়েই আত্মার প্রকাশ ঘটেছে এবং আত্মার বশবর্তী হয়েই মণ্ডলীর জন্ম বা সূচনা। একই ভালোবাসা খ্রিস্টভক্তগণ একে অপরের প্রতি প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একতাবদ্ধ।

৪। বিশ্বাস, সাক্রামেন্ত ও প্রৈরিতিক উত্তরাধিকার: খ্রিষ্টমণ্ডলী এক তার দৃশ্যমান মিলনবন্ধন বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রৈরিতিক উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে। খ্রিষ্টমণ্ডলীতে বিশ্বাস এক। একই সৃষ্টিকর্তায় আমরা বিশ্বাস করি। একই সংস্কারীয় অনুগ্রহে আমরা অনুগ্রহভাজন এবং পবিত্র আত্মার নেতৃত্বে খ্রিষ্টভক্ত হিসেবে আমরা সবাই পরিচালিত।

কাজ: মণ্ডলীতে ঐক্য থাকার প্রয়োজনীয়তা কেন তা দলে আলোচনার মাধ্যমে লেখ ও পরে সকলের সামনে উপস্থাপন কর।

পাঠ ২: খ্রিষ্টমণ্ডলী সার্বজনীন

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ ও জাতির কৃষ্টি এবং আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মণ্ডলীর দিক থেকে খ্রিষ্টভক্তগণ কাথলিক অথবা বিভিন্ন প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। তথাপি মণ্ডলীর সূচনা থেকে আমরা সবাই সার্বজনীন। সার্বজনীন কথাটাকে অন্যকথায় বলা হয় কাথলিক। খ্রিষ্ট তাঁর অনুসারীদের মনোনীত, নিযুক্ত ও প্রেরণ করেছেন সকল জাতির সকল মানুষের কাছে। তিনি বলেছেন তোমরা জগতের সর্বত্র যাও। সবার কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার। তিনি আরও বলেছেন মৃত্যুলোকের কোনো শক্তি মণ্ডলীকে কখনো পরাভূত করতে পারবে না। যীশু একথা বলেছেন, কারণ তিনি সবসময় পথপ্রদর্শক ও রক্ষাকর্তা হিসেবে মণ্ডলীর সাথে রয়েছেন। মণ্ডলীর সূচনাতে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ভাষাভাষির উপস্থিতি মণ্ডলীর সার্বজনীনতার প্রকাশ যা বিরাজ করবে খ্রিষ্টের পুনরাগমন পর্যন্ত।

খ্রিষ্টমণ্ডলী কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে সার্বজনীন হয়েছে। প্রভু যীশু খ্রিষ্ট নিজেই মণ্ডলী স্থাপন করেছেন এবং তা তাঁর মনোনীত শিষ্যদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। যীশু পিতরের নাম দিয়েছেন পাথর। এই পাথরের উপর তিনি তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। পিতরের দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির কারণে পিতরের ওপরই মণ্ডলীর দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। পিতরের উত্তরাধিকারী হিসেবে পরবর্তীতে অন্যান্য পোপগণ মণ্ডলীর দেখাশুনা করার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ক্ষুদ্র মণ্ডলী ও বৃহত্তর মণ্ডলী– দুই-ই রোমের সাথে যুক্ত হয়ে সবার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ভালোবাসা হলো প্রেরণকর্মের প্রেরণা। মণ্ডলী তার নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে খ্রিষ্টের ভালোবাসা চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তাছাড়া একই খ্রিষ্ট যীশুতে বিশ্বাস ও সংস্কারীয় সেবা দায়িত্ব আমাদের সার্বজনীনতা দান করে। মণ্ডলীতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর অবস্থান এবং কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন। তথাপি সব খ্রিষ্টভক্তই একই খ্রিষ্ট যীশুতে দীক্ষিত। অনেক দিক দিয়ে সব মণ্ডলীর বিশ্বাসের অনেক মিল রয়েছে। সেই কারণে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সবসময় চলছে। এটা খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। যে-কোনো মুহূর্তে যে-কেউ এতে যুক্ত হতে পারবে। মণ্ডলী সবার জন্য সেবার হাত বাড়িয়ে রেখেছে এবং সবার মাঝে খ্রিষ্টীয় ভালোবাসা ও প্রেম বিলিয়ে দিচ্ছে।

কাজ: নিকটবর্তী একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যাবে ও সেখানে গিয়ে বাস্তবে সবার জন্য সেবাকাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মণ্ডলীর সার্বজনীনতা প্রকাশ করবে।

পাঠ ৩: খ্রিষ্টমণ্ডলী পবিত্র

পবিত্র বলতে বোঝায় বিশুদ্ধ বা খাঁটি। এই কথার দ্বারা নিষ্পাপ বা পাপহীন এবং নির্মল অবস্থাকেও বোঝায়। ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিষ্ট পবিত্র মণ্ডলী স্থাপন করার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। কারণ পিতা সকল মানুষকে

পবিত্রতার পথে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছিলেন। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে তাঁরই মতো পবিত্র করে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মানুষ পাপ দ্বারা সেই প্রতিমূর্তি অর্থাৎ তাঁর দেওয়া পবিত্রতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই ঈশ্বর তাকে আবার সেই প্রতিমূর্তি অর্থাৎ পবিত্রতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন। পুত্র এসে জীবন দিয়ে পবিত্রতা ফিরিয়ে এনেছেন। এই কাজটি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত যেন চলতে থাকে সেজন্যে তিনি একটি মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। এই কারণে খ্রিষ্টমণ্ডলী পবিত্র।

প্রভু যীশু খ্রিষ্ট নিজেই পবিত্র। তাঁর দ্বারা স্থাপিত মণ্ডলীও পবিত্র। তিনি মণ্ডলীকে পবিত্র আত্মার দানে ভূষিত করেছেন। মণ্ডলীকে তাঁর বধূরূপে ও তাঁর দেহরূপে তুলনা করে তাঁর পবিত্রতা দান করেছেন। তাঁদেরকে আপন করে নিয়েছেন। ভ্রাতৃপ্রেম হচ্ছে পবিত্রতার প্রাণস্বরূপ যা অর্জন করার জন্য আমরা সবাই আহ্বান পেয়েছি। এই ভ্রাতৃপ্রেম মণ্ডলীকে পবিত্রতার পথে পরিচালিত করে, অর্থপূর্ণ করে এবং পূর্ণতা দান করে।

আমাদের এই পৃথিবীটা একটা জমির মতো। এখানে ভালো ফসলের গাছ ও পাশাপাশি আগাছা রয়েছে। আমাদের নিশ্চয় মনে আছে যীশুর বলা সেই গমের দানা ও শ্যামাঘাসের উপমা কাহিনীটি। ঐ গল্পটিতে যীশু বলেছেন, এক জমির মালিক জমিতে গমের বীজ বুনেছেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষ সেই একই জমিতে শ্যামাঘাস অর্থাৎ আগাছার বীজ বুনে দিয়েছে। গমের গাছ ও শ্যামাঘাস দেখতে প্রায় একই রকম। তাই একই সাথে তারা বাড়তে লাগল। কিন্তু পার্থক্য বোঝা গেল যখন তা পূর্ণভাবে বড় হলো, ঠিক ফসল ফলাবার আগে। মালিকের কর্মচারীরা আগে শ্যামাঘাস তুলে ফেলতে চাইল। কিন্তু জমির মালিক তাতে রাজি হননি। কারণ তার ভয় ছিল, যদি শ্যামাঘাস তুলতে গিয়ে তারা গমের গাছ তুলে ফেলে। তাই তিনি দুইটাকেই এক সাথে বাড়তে দিলেন।

হৃদয়ের পবিত্রতার সাথে মানুষের মুখের পবিত্রতার সম্পর্ক

এর মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু বুঝিয়েছিলেন মালিক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, গম হলো ভালো লোক, শ্যামাঘাস হলো মন্দ লোক, জমি হলো এই পৃথিবী, শত্রুপক্ষ হলো শয়তান। এই পৃথিবীতে ভালো ও মন্দ লোকের সহ-অবস্থান। ঈশ্বর পাপীর ধ্বংস চান না। বরং তিনি চান পাপী মন পরিবর্তন করে তাঁর পথে ফিরে আসুক। তাই তিনি অপেক্ষা করেন, সময়-সুযোগ দান করেন।

দেখা যায় এই জগতে অনেকেই পবিত্রভাবে জীবন যাপন করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেই আহ্বানে পূর্ণভাবে সাড়া দান করেন। মণ্ডলী তাদের স্বীকৃতি দান করার মাধ্যমে সাধু-সাধ্বীর মর্যাদা দান করেন। খ্রিষ্ট আমাদের সেই একই আহ্বান জানান যেন আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদেরকেও পবিত্র করে তুলতে পারি।

কাজ: পবিত্র থাকার অর্থ এবং কীভাবে পবিত্র থাকা যায় তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা ও উপস্থাপন কর।

পাঠ ৪: খ্রিষ্টমণ্ডলী প্রৈরিতিক

আমাদের মা-বাবা বা গুরুজনেরা আমাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় কাজের উদ্দেশ্যে পাঠান। আমাদের মা-বাবা আমাদেরকে বিশেষ এই কাজটি করার জন্য নিযুক্ত করেন এবং পাঠান। এই অর্থে আমরা প্রেরিত।

খ্রিষ্টমণ্ডলীও শুরু থেকে প্রৈরিতিক কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছে কারণ খ্রিষ্ট নিজেই পিতার দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন। তিনটি বিশেষ অর্থে আমরা খ্রিষ্টমণ্ডলীকে প্রৈরিতিক বলতে পারি:

১। খ্রিষ্টমণ্ডলী প্রেরিতদূতদের বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা সাক্ষ্যদানের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত এবং প্রেরণকর্মের জন্য প্রেরিত।

২। আত্মার সহায়তায় খ্রিষ্টমণ্ডলী প্রেরিতদূতদের মুখ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছে, তা সযত্নে রক্ষা করে চলছে এবং মানুষের মাঝে তা পৌঁছে দিচ্ছে।

৩। বিশপ, যাজক ও পালকদের সহায়তায় কেন্দ্রীয় পরিচালনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে খ্রিষ্টের পুনরাগমন পর্যন্ত মণ্ডলীকে শিক্ষাদান, পবিত্রীকরণ ও পরিচালনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রভু যীশু নিজে প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি একা একা কিছু করেন না। তিনি বলেন, নিজে থেকে আমি কিছুই করতে পারি না। পিতার কাছ থেকে যা পেয়েছি তাই প্রচার করি এবং অন্যকে সংযুক্ত করি। যীশু যেমন পিতা ছাড়া কিছু করতে পারেন না ঠিক তেমনি আমরাও প্রভু যীশুর শক্তি ছাড়া কিছুই করতে পারি না। পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হওয়ার জন্য আমরা সবাই আহূত, মনোনীত ও প্রেরিত।

কাজ: নিজ পরিবার, বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজে তুমি কী কী প্রৈরিতিক কাজ করতে পার তা লেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. সকল পবিত্রতার উৎস—————————।

২. খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে আকার ও বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা থাকলেও সবাই ——————।

৩. শ্যামাঘাস হলো —————— লোক।

৪. তিনটি বিশেষ অর্থে আমরা খ্রিষ্টমণ্ডলীকে —————— বলতে পারি।

৫. তিনি চান পাপী —————— পরিবর্তন করে তাঁর পথে ফিরে আসুক।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. খ্রিষ্টমণ্ডলী মূলত	▪ কর্ণধার
২. প্রভু যীশু মণ্ডলীর	▪ এক ও সার্বজনীন
৩. খ্রিষ্টমণ্ডলীতে বিশ্বাস	▪ পাথর
৪. যীশু পিতরের নাম দিয়েছেন	▪ এক
৫. ঈশ্বর মানুষকে তাঁর	▪ আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন
	▪ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সকল পবিত্রতার উৎস কে ?

ক. ঈশ্বর খ. যীশু

গ. পবিত্র আত্মা ঘ. স্বর্গদূত

২. মানুষ কীভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একতাবদ্ধ ?

ক. সেবার মাধ্যমে

খ. ভালোবাসার মাধ্যমে

গ. সহভাগিতার মাধ্যমে

ঘ. বিশ্বাসের মাধ্যমে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মিলন খ্রিষ্টান সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি। খ্রিষ্টান সমাজের উন্নয়নের জন্য তিনি রাত-দিন কাজ করে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে মিলনের প্রচেষ্টা এবং সমাজের লোকদের ভালোবাসা, একতা ও বিশ্বাসে পবিত্র সমাজ গড়ে উঠল।

৩. কার অনুপ্রেরণায় মিলন উক্ত কাজটি করতে উৎসাহিত হয়েছিলো ?

ক. ফাদার

খ. খ্রিষ্টমণ্ডলী

গ. পবিত্র আত্মা

ঘ. যীশু খ্রিষ্ট

৪. মিলনের কর্মকাণ্ডে সমাজে যে প্রভাব পড়বে তা হলো–

i. প্রচেষ্টা

ii. ভালোবাসা

iii. বিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পুরোহিত রূপম মণ্ডলীকে ভালোবাসেন বলেই তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মণ্ডলীকে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি করে তুলেছেন। কিন্তু মণ্ডলীর এক যুবক সীমান্ত পুরোহিতের অজান্তে অনেক খারাপ কাজ করে এবং মণ্ডলীর কয়েকজন যুবককেও বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করে। মণ্ডলীর সম্পাদক সীমান্তের এ কাজ বুঝতে পেরে পুরোহিতকে জানায় এবং মণ্ডলী থেকে বের করে দিতে বলে। কিন্তু পুরোহিত বললেন, 'না বের করার দরকার নেই। তার জন্য সুযোগ দান কর।' ধীরে ধীরে ভুল বুঝতে পেরে সীমান্ত সঠিক পথে ফিরে আসে।

ক. পবিত্র বলতে কী বোঝায় ?

খ. ঈশ্বরপুত্র কেন পৃথিবীতে এসেছেন ?

গ. পুরোহিতের কোন শিক্ষায় সীমান্ত সঠিক পথে ফিরে আসে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সীমান্তের পবিত্র জীবনের ফলাফল কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর।

২. মাদার তেরেজা ছিলেন একজন ইউরোপীয় ও খ্রিষ্টান। কিন্তু বিশ্বের সকল দেশের সকল ধর্মের মানুষের জন্য তাঁর সেবা ও ভালোবাসা উন্মুক্ত। ধর্ম, দেশ ও জাতির ভিন্নতা বা পার্থক্য তিনি কোনো দিনও বিবেচনায় নেননি। তাঁকে অনুসরণকারী ভগ্নিদের নিয়ে তিনি গঠন করেন মানবসেবা সংঘ 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি'। রাস্তায় পড়ে থাকা সহায়-সম্বলহীন মানুষের আশ্রয়ের জন্য 'নির্মল হৃদয়' এতিম শিশুদের জন্য 'শিশু ভবন', মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য 'নবজীবন আবাস ' কুষ্ঠরোগীদের জন্য 'প্রেমনিবাস' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে অসীম মমতায় সেবা দান করেন। তাঁর সংঘের ভগ্নিদের নিয়ে তিনি একতার জীবন গড়ে তুলে সকলের মাঝে দায়িত্ব দেন এবং নিজে আদর্শস্বরূপ কাজ করেন।

ক. প্রেরণকর্মের প্রেরণা কী ?

খ. খ্রিষ্টমণ্ডলী কেন পবিত্র ?

গ. মাদার তেরেজা কোন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে উপরের কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করেছিলেন ?

ঘ. 'খ্রিষ্টমণ্ডলী এবং মিশনারিজ অব চ্যারিটি' উভয়ই সার্বজনীন– উদ্দীপক পাঠের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মণ্ডলীর সূচনা হলো কীভাবে ?
২. খ্রিস্টমণ্ডলী কী কারণে পবিত্র ?
৩. কী অর্থে আমরা খ্রিস্টমণ্ডলীকে প্রৈরিতিক বলি ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রৈরিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর।
২. কী কী কারণে খ্রিস্টমণ্ডলী এক ? ব্যাখ্যা কর।
৩. সমাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখতে খ্রিস্টমণ্ডলীর ভূমিকা বর্ণনা কর।

নবম অধ্যায়

ক্ষমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম

ক্ষমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম শুধু সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ নয়, ধর্মীয় মূল্যবোধও বটে। ক্ষমার মনোভাব নিয়ে যে কোনো কাজ আমরা করব তা হবে উত্তম। সহনশীলতা আমাদের কাজে, চিন্তায় ও আচরণে পরিপক্বতা আনে। দেশপ্রেম মনের মাঝে ভালো কিছু করার ইচ্ছাকে আরও শক্তি যোগাবে।

ক্ষমা ও পুনর্মিলন

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- ক্ষমা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষমা করার সুফলগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- ক্ষমা করা ও না-করার ফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সহনশীলতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- সামাজিক জীবনে সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সহনশীলতা অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দেশপ্রেম সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- ক্ষমাশীল ও সহনশীল মানুষ হিসেবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবো।

২০২০

পাঠ ১: ক্ষমা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা

কাজ: নিচের শাস্ত্রাংশটি নিজ নিজ খাতায় লেখ এবং এক মিনিট নীরবে ধ্যান কর–এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কী বলতে চান।

"তোমরা একে অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমলপ্রাণ। পরস্পরকে ক্ষমা করে নাও, যেমন খ্রিস্টে তোমাদের আশ্রয় দিয়ে পরমেশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন" (এফ ৪:৩২)।

নিজে কাউকে ক্ষমা করে থাকলে বা কেউ তোমাকে কোনো অপরাধের জন্য ক্ষমা করে থাকলে তা দলে অন্যদের সাথে সহভাগিতা কর।

এবার আমরা পর পর দুইটি ঘটনার বিবরণ শুনব এবং এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে আমরা কী করতাম তা নিজ নিজ খাতায় লিখব।

১। প্রথম ঘটনা

আন্না ও নমিতা খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। আন্না তার বান্ধবী নমিতাকে খুব বিশ্বাস করত। সে একবার নমিতার সাথে খুব গোপন একটি বিষয় আলাপ করল। সে মনে করেছিল, এই বিষয়টি নমিতা কারো সাথে আলাপ করবে না। কিন্তু নমিতা তা গোপন না-রেখে অন্য একজন বান্ধবীর কাছে বলে দিল। নমিতা শুধু আন্নার কথাটাই বলেনি, একইসঙ্গে সে আরও কিছু কথা বানিয়ে যোগ করে দিল। আন্না মনে খুব দুঃখ পেল কারণ তার বান্ধবী কথাটা গোপন রাখবে বলে যে কথা দিয়েছিল তা রাখেনি। এতে নমিতার ওপর তার অনেক রাগও হলো। মনে মনে সে বলল, নমিতার সাথে সে আর কখনো কথা বলবে না।

কাজ: ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা কর: এরকম পরিস্থিতি তোমার নিজের হলে তুমি কী করতে তা তোমার খাতায় লেখ।

২। দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন ক্লাসে শিক্ষক দলীয় আলোচনা দিলেন। দলীয় আলোচনায় যাবার আগে সাগর তার হাতঘড়িটা খুলে টেবিলের উপর রেখেছিল। দলীয় আলোচনার জন্য সে অন্য এক জায়গায় বসেছিল। তার দল থেকে নিজের জায়গায় এসে সে ঘড়িটা আর খুঁজে পেল না। সে সবাইকে জিজ্ঞেস করল কিন্তু কেউই নিয়েছে বলে স্বীকার করল না। তাতে সাগরের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। পরদিন স্কুলে আসার আগে দীপ সাগরের বাড়িতে গেল। সে সাগরের কাছে স্বীকার করল যে সে-ই ঘড়িটা নিয়েছিল। এই বলে সে ঘড়িটা ফেরত দিল আর খুব অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চাইল। সাগর খুব খুশি হয়ে বলল, "ভাই, তোমাকে আমি অবশ্যই ক্ষমা করি কারণ তুমি সাহস নিয়ে আমার কাছে এসে তোমার দোষ স্বীকার করেছ এবং ঘড়িটা ফেরত দিচ্ছ। আমি কথা দিচ্ছি, আমি সবই ভুলে যাব।" তারা আবার বন্ধু হয়ে গেল।

কাজ: সাগরের স্থলে তুমি হলে তুমি কী করতে, প্রত্যেকে নিজ নিজ খাতায় লেখ ও উপস্থাপন কর ।

মুক্তিদাতা যীশু আমাদেরকে নিজের আদর্শ দিয়ে ক্ষমার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। এবার আমরা একটা শাস্ত্রাংশ শুনব। যীশু সমবেত লোকদেরকে বললেন: "তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকালের মানুষদেরকে এই কথা বলা হয়েছিল: 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে আর তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: 'তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবাস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর' (মথি ৫:৪৩)।

যীশুকে তাঁর শত্রুরা ধরে এনে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, বিনা দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছে, নিজেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এতেও যীশু কোনো কথা বলেননি। তাঁর মধ্যে প্রতিশোধের কোনো ভাব ছিল না। তিনি বৃহৎ এক ক্রুশ বহন করে কালভেরি পর্বতের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর মুখে থুথু দেওয়া হয়েছে; তাঁকে চড়, ঘুষি, লাথি ও চাবুক মারা হয়েছে। ক্রুশে তাঁকে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পান করতে চাইলে শত্রুরা তাঁকে সির্কা খেতে দিয়েছে। তবুও তিনি সব নীরবে সহ্য করেছেন। পিতার কাছে কাতর মিনতি জানিয়ে তিনি বলেছেন, "পিতা, ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে না!" (লুক ২৩:৩৪)।

ঈশ্বরের ক্ষমা পেতে চাইলে আমাদেরও একে অপরকে ক্ষমা করতে হবে

কাজ: দলে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা কর:

১। তুমি যদি কাউকে কোনোদিন ক্ষমা করে থাক তা দলে অন্যদের সাথে সহভাগিতা কর।
২। কারও বিরুদ্ধে তোমার অন্তরে চাপা ক্ষোভ, রাগ বা প্রতিশোধের মনোভাব থাকলে তা তুমি কীভাবে জয় করতে পার এবং সত্যি সত্যি ক্ষমা করে দিতে পার?
৩। প্রার্থনা তোমাকে কীভাবে ক্ষমা করতে শেখাতে পারে?
৪। যীশু তোমাকে কীভাবে ক্ষমা করতে শেখাতে পারেন?

আমরা পাপ করলেও যদি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাই তবে আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। ঈশ্বর যা একবার ক্ষমা করেন তা আর কখনো মনে আনেন না। আমরাও যখন কারো অপরাধ ক্ষমা করি তখন যেন আর তা মনে না-আনি।

নিচের শাস্ত্রাংশগুলো নিয়ে ধ্যান করি:

পিতর এগিয়ে এসে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন: "প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি বারবার অন্যায় করলে তাকে আমায় কতবার ক্ষমা করতে হবে? সাত সাতবার?" যীশু উত্তর দিলেন: "আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার" (মথি ১৮:২১–২২)।

"তোমরা একে অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমলপ্রাণ। পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা করে নাও, যেমন খ্রিষ্টে তোমাদের আশ্রয় দিয়ে পরমেশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন" (এফেসীয় ৪:৩২)।

উপরে যে দুইটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছি তা আবার স্মরণ করি। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে উত্তর আগে দিয়েছিলাম তা আবার চিন্তা করি। যদি আমার মন্তব্য পরিবর্তন করতে চাই তা এখন করতে পারি।

কাজ: নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে দলে আলোচনা কর ও প্রতিবেদন প্রস্তুত কর:

১। আমি যদি আন্নার স্থানে থাকতাম তবে নমিতার সাথে আমি কেমন আচরণ করতাম?
২। আন্না ও সাগর যদি সত্যিই অন্তর থেকে ক্ষমা করে থাকে তবে তাদের অন্তরে তখন কী রকম অনুভূতি হয়েছিল?

পাঠ ২: ক্ষমা করার সুফল ও না করার কুফল

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ক্ষমা করার ফল সবসময়ই ইতিবাচক এবং ক্ষমা না করার ফল সব সময়ই নেতিবাচক। প্রথমে আমরা দেখি ক্ষমা করার সুফলগুলো।

ক্ষমার সুফল

কারো বিরুদ্ধে আক্রোশের মনোভাব থাকলে তা ক্ষমা করে দিলে অন্তরে যেসব ভালো ফল পাওয়া যায় সেগুলো হলো:

১। অন্তরে শান্তি বিরাজ করে, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

২। মনের দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ বা অশান্তি, বৈরী মনোভাব কমে যায়।

৩। অন্যদের জন্য সহানুভূতি ও উদারতার জন্ম হয়।

৪। মানুষের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

৫। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উন্নতি করা যায় অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়া সম্ভব হয়।

৬। রক্তচাপ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

৭। হতাশার ভাব কেটে যায়।

৮। কোনো রকম মাদকাসক্তির আশঙ্কা থাকে না।

৯। আদর্শবান মানুষ হিসেবে অন্যদের কাছে নিজেকে তুলে ধরা যায়।

১০। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

১১। জীবনের প্রতিটি মূহুর্তকে শান্তি ও আনন্দে ভরে তোলা যায়।

ক্ষমা না করার কুফল

খুব ঘনিষ্ঠ বা যাকে আমরা খুব বিশ্বাস করি এরকম কেউ যদি আমাদেরকে কোনোভাবে আঘাত দেয় তবে নিশ্চয়ই আমরা খুব দুঃখ পাই ও রাগান্বিত হই। সেই রকম অনুভূতি যদি আমরা দিনের পর দিন মনের মধ্যে ধরে রাখি তবে আমাদের অন্তরে আক্রোশের মনোভাব বাসা বাঁধে।

১। আমরা তখন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাই আর বৈরী মনোভাব পোষণ করি।

২। আমরা যদি আমাদের নেতিবাচক অনুভূতিগুলোকে বেশি বাড়তে দেই তবে সেগুলো আমাদের ইতিবাচক অনুভূতিগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর তখন আমাদের মনে তিক্ততা ও অন্যায্যতা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

৩। যদি আমরা ক্ষমা করতে না চাই তবে আমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই।

৪। ক্ষমা না করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই মূল্য দিতে হয়। পরস্পরের সাথে আমাদের সম্পর্কে রাগের ভাব এসে যায়।

৫। আমরা মনের মধ্যে অতীতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। ফলে বাস্তবের আনন্দগুলোকে আমরা ভোগ করতে পারি না।

৬। আমাদের মনে হতাশা কাজ করতে থাকে। তখন আমাদের কাছে জীবনটা নিরানন্দ ও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৭। আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের আর আকর্ষণ করে না। আমরা স্বর্গের পথ হারিয়ে ফেলি।

৮। অন্যদের সাথেও আমাদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। আমরা একাকী হয়ে যাই।

৯। সকল কাজে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবনা বৃদ্ধি পায় ও সকলের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়।

কাজ: একটি পুনর্মিলন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এতে করে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা দেওয়ার সুযোগ পাবে ও সকলেই ক্ষমার অভিজ্ঞতা বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারবে।

পাঠ ৩: সহনশীলতা

সহনশীলতা অর্থ হচ্ছে নির্মম বা বিরক্তিকর অনুভূতি দমন করার সক্ষমতা বা ইচ্ছা। সহনশীলতা দ্বারা শান্ত ও অটল অধ্যবসায়ও বোঝায়। সেই ব্যক্তিকেই আমরা সহনশীল বলি যিনি প্ররোচনা, উসকানি, বিরক্তি, দুর্ঘটনা, বিলম্ব, কষ্টকর পরিস্থিতি, দুর্ভোগ, ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি পরিস্থিতি সহ্য করতে পারেন। তিনি এগুলো সহ্য করতে পারেন সংযম ও ধৈর্য সহকারে ।

আমরা জীবনে যা-কিছু করি প্রায় সবকিছুর জন্যই সহনশীলতা প্রয়োজন। আমরা প্রায়ই কোনো এক স্থানে রওনা দিয়ে যানজটে আটকা পড়ে যাই, ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে বা কোনো জায়গায় যাওয়ার টিকেট কাটার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়। এসব স্থানে রাগারাগি বা চিৎকার করলেও কোনো লাভ হয় না। সেখানে সহনশীল মনোভাব নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো গতি থাকে না।

সহনশীলতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা

সাধু পল বলেন: "আমরা যা দেখতে পাই না, তার আশা যখন করি, তখন সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকি" (রোমীয় ৮:২৫)।

সাধু যাকোব বলেন: "মনে রেখো, যাঁরা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছেন, তাঁদেরই আমরা ধন্য বলে থাকি। যোবের সেই নিষ্ঠতার কথা তোমরা তো শুনেছ; আর এ-ও দেখেছ যে, প্রভু এ ব্যাপারে শেষে কী করেছিলেন। তাঁর তো তা করারই কথা: প্রভু যে দয়াময়, করুণানিধান!" (যাকোব ৫:১১)।

সাধু যাকোব যোবের উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা জানি যোব তাঁর সব সহায় সম্পত্তি, ছেলেমেয়ে, যত পশুসম্পদ, এমনকি তাঁর সব অর্থকড়িও হারিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবেরা এসে তাঁকে নানারকম অসৎ উপদেশ দিয়েছেন। এধরনের সমস্ত পরীক্ষায় যোব উত্তীর্ণ হয়েছেন কারণ তিনি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে কোনোরকম পাপ করতে চাননি। যোবের গ্রন্থে বলা হয়েছে: "এত কিছু ঘটা সত্ত্বেও যোব এমন কিছুই করলেন না, যাতে পাপ হয়। ঈশ্বরের প্রতি নির্বোধের মতো কোনো অভিযোগও করলেন না তিনি" (যোব ১:২২)। যোবের স্ত্রী পরামর্শ দিয়েছিলেন, যোব যেন ঈশ্বরকে ত্যাগ করেন। তাই যোব স্ত্রীকে বলেছিলেন, "নির্বোধ মেয়েরা যেমন কথা বলে, তুমি তো সেইরকম কথা-ই বলছ। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা যেমন সুখ গ্রহণ করে থাকি, তেমনি দুঃখও কি গ্রহণ করব না?" (যোব ২:১০)।

সাধু পিতর বলেন: "আর তাই তো তোমাদের মনে এত আনন্দ, যদিও এখন কিছুকালের জন্য তোমাদের নানা পরীক্ষায় দুঃখকষ্টও পেতে হচ্ছে, যাতে ঈশ্বরের ওপর তোমাদের বিশ্বাস যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়; এমন বিশ্বাস, সে তো নশ্বর স্বর্ণের চেয়ে অনেক মূল্যবান–যদিও স্বর্ণটা আগুনে যাচাই করা হয়! আর এমন বিশ্বাসই যীশু খ্রিষ্টের সেই মহা আত্মপ্রকাশের দিনে তোমাদের প্রশংসা, সম্মান ও মহিমার কারণ হয়ে দাঁড়াবে" (১পিতর ১:৬–৭)।

প্রবচন গ্রন্থে বলা হয়েছে: "অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব, এমন কথা কখনো বলো না; তুমি বরং ঈশ্বরের ওপরেই আস্থা রাখো, তোমাকে বাঁচাবেন তিনি" (প্রবচন/হিতোপদেশ ২০:২২)।

সাধু পল বলেন: "সমস্ত নিষ্ঠা, সমস্ত আশ্বাসের উৎস স্বয়ং পরমেশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, খ্রিষ্ট যীশুর আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একপ্রাণ হতে পার" (রোমীয় ১৫:৫)। তিনি আরও বলেন, "শুধু

তাই নয়: আমরা তো আমাদের দুঃখ-দুর্ভোগ নিয়েও গর্ব করে থাকি; কেন না আমরা জানি যে, দুঃখ-দুর্ভোগ থেকে জাগে নিষ্ঠা আর নিষ্ঠা থেকে চারিত্রিক যোগ্যতা, আর চারিত্রিক যোগ্যতা থেকে অন্তরে জেগে ওঠে আশা" (রোমীয় ৫:৩–৪)।

সাধু যাকোব বলেন: "শোন, ভাই, প্রভু যতদিন না-আসেন, ততদিন তোমরা বরং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর। চাষির কথা একবার ভেবে দেখ, সে কেমন করে জমির মূল্যবান ফসলের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, তার জন্যে কেমন ধৈর্য ধরেই সে অপেক্ষা করে, যতক্ষণ-না নেমে আসে প্রথম আর শেষ বর্ষার জল" (যাকোব ৫:৭)।

পাঠ ৪: ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সহনশীলতা চর্চার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ হিসেবে আমাদের যত গুণ আছে তার মধ্যে প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মুহূর্তে এই সহনশীলতা গুণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" (মথি ১৬:২৪)। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে একজন বিশ্বস্ত খ্রিষ্টভক্তের জীবনে নানারকম বিপদ আপদ, দুঃখযন্ত্রণা, অর্ন্তজ্বালা ইত্যাদি আসবেই। যীশুর নামে সেগুলো সহ্য করতেই হবে। এগুলো তার জীবনে আসবে কারণ সে যীশুকে ভালোবাসে।

সহনশীলতা আসে একটি ল্যাটিন শব্দ patiencia থেকে, যার অর্থ 'কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা'। অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমরা চাই বা না-চাই, আমাদের সহ্য করতেই হয়। যেমন রান্না বসিয়ে অপেক্ষা করা, পড়াশুনার জন্য সময় দেওয়া, পরীক্ষায় লিখে ফলের জন্য কয়েক মাস অপেক্ষা করা, ক্ষেতে ফসল বুনে কয়েক মাস অপেক্ষা করা, রাস্তায় যানজটে আটকে থাকা, টিকেট কাটার জন্য কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি। এগুলোর জন্য সময় প্রয়োজন হয়। তাড়াহুড়া করলে কাজ ঠিকমতো হয় না। এছাড়া, ভিড়ের রাস্তায় তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে আমাদের সহনশীল হতে হয়। যখন আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হয় বলে বাসে বা রিকসায় উঠি আর বাসের ড্রাইভার বা রিকসাওয়ালা যদি দ্রুত না-চালায় তবে আমরা অনেক সময় অধৈর্য হয়ে যাই। এসময়ও আমাদের সহনশীল হতে হয়।

সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে সহনশীলতার গুণটি চর্চা করে আমরা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারি, হতে পারি অনেকের কাছে অনুকরণীয়। পরিবারে, বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে বন্ধুদের সাথে আড্ডায়–সব জায়গাতে ও সব কাজে আমাদের সহনশীল হতে হবে।

লাইনে দাঁড়ানো

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সময় সহনশীলতা দেখাতে হবে। অন্যের মতামতকে সম্মান জানাতে হবে। বিশেষভাবে রাস্তায় চলাচলের সময় অপরিচিত কারো সাথে কথা বলার সময় আমাদের সংযত আচরণ করতে হবে, সহনশীল হতে হবে।

কখনো কখনো আমরা প্রার্থনা করে সাথে সাথে ফল চাই। তখন আমাদের মনে রাখতেই হয়, ঈশ্বর যখন চাইবেন তখন আমার চাওয়াটা পূরণ করবেন।

পাঠ ৫: সহনশীলতা অর্জনের উপায়

একটি প্রবাদবাক্য আমরা প্রায়ই উচ্চারণ করে থাকি, "যে সহে, সে রহে।" প্রবাদবাক্যটিতে সহনশীলতার জয় যে সুনিশ্চিত তা বুঝানো হয়েছে। সহনশীলতা একটি অর্জনযোগ্য মানবিক গুণ। আমরা নিম্নলিখিতভাবে চেষ্টা করলে সহনশীলতা অর্জন করতে পারি:

ক) ঈশ্বরভক্ত মানুষ হিসেবে নিয়মিত প্রার্থনা করে ও ঈশ্বরের পরিচালনায় বিশ্বস্ত থেকে।
খ) দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা ঠিক রেখে নিয়মিত খাবার গ্রহণ ও পরিমিত বিশ্রাম নিয়ে।
গ) মনের মধ্যে কোনো ধরনের রাগ ও হিংসা পোষণ না করে।
ঘ) কোনো কাজে বা পরিস্থিতিতে মানসিক চাপ সৃষ্টি হলে তার ভারসাম্য বজায় রেখে মোকাবেলা করে।
ঙ) কাজে জয় পেলে যথাসাধ্য স্বাভাবিক আচরণ করে এবং পরাজিত হলে তা মেনে নিয়ে।
চ) মহামনীষীদের জীবন ও কাজ অনুসরণ করে।
ছ) কোনো বিরোধের কারণে সম্পর্কের অবনতি হলে তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলে।
জ) সমাজে অবহেলিত ও গরিব–দুঃখী মানুষের জন্য কাজ করে এবং সবসময় তাদের পাশে থেকে।
ঝ) বিভিন্ন পাবলিক সার্ভিস ও প্রতিষ্ঠানে যেমন ব্যাংক থেকে সেবা নিতে বা ট্রেনে কিংবা বাসে টিকিট কাটার সময় লাইনে দাঁড়িয়ে সেবা নিয়ে।
ঞ) জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসলে, কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত হলে সরল ও নম্র মন নিয়ে তা গ্রহণ করে আমরা সহনশীলতা অর্জন করতে পারি।

'সবুরে মেওয়া ফলে' কথাটি প্রতিটি মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপেক্ষা করা, ধৈর্য ধরা, সহনশীল হওয়া সবই বিজয়ী হওয়ার উপায়। আমরা জানি বর্তমান পৃথিবীতে নানা প্রতিকূলতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। জীবনের যে-কোনো কাজে ও পরিস্থিতিতে সহনশীল থেকে তা মোকাবেলা করে জয়ী হয়ে জীবনকে সাজানোর জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

পাঠ ৬: দেশপ্রেম

নিজ দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ বা ভালোবাসাকে দেশপ্রেম বলা হয়। দেশপ্রেমের সাথে জড়িত থাকে জাতীয়তাবোধ। প্রত্যেক দেশের মানুষের মধ্যেই দেশের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতায় ভালোবাসার কথা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন:–
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;–
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,–
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

কপোতাক্ষ নদ কবিতায় মাইকেল মধুসূদন বলেন:

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!–
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ–দলে,

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া–যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

ইংরেজ কবি সামুয়েল জনসন বলেছেন দেশপ্রেম বলতে বোঝায় 'দুরাচারী ব্যক্তির সর্বশেষ আশ্রয়স্থল'। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, সব মানুষের এমনকি দুর্বৃত্ত বা দুরাচারী ধরনের ব্যক্তিরও একটা আশ্রয়স্থল দরকার। আর সেই আশ্রয়স্থল হলো তার মাতৃভুমি তার আপন দেশ।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা

মা-মাটি-মাতৃভুমি এই তিন 'ম' যে কোনো মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় শব্দ। এই তিনকে ভালোবাসাই হলো দেশপ্রেম। দেশের মাটির ফসল, ফলমূল মানুষের জীবন বাঁচায়, দেশের বন-বনানী ও প্রকৃতি পরম মমতায় উদারভাবে আমাদের প্রয়োজন মেটায়। তাইতো দেশের প্রতি আমাদের মনে মমতা সৃষ্টি হয়। দেশের প্রতি মমত্ববোধও দেশপ্রেম নিয়ে আমরা সব কাজ করব। তাই তো জাতীয় সংগীতে আমরা গেয়ে উঠি:

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

পবিত্র বাইবেলে দেশপ্রেম সম্পর্কে শিক্ষা

"যাঁদের হাতে রয়েছে শাসন করার অধিকার, সকলেই যেন তাঁদের অনুগত হয়ে থাকে, কেননা তেমন কর্তৃত্বের অধিকার মাত্রই আসে পরমেশ্বরের কাছ থেকে। যাঁদের হাতে কর্তৃত্বের দায়িত্ব রয়েছে, তাঁরা তাঁর কাছ থেকেই তা পেয়েছেন। আর তাই তো কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা যে করে, সে কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর যা স্থির করে রেখেছেন, তারই বিরোধিতা করে। তেমন বিরোধিতা যারা করে, তারা নিজেরা নিজেদের ওপর শাস্তি ডেকে

আনবেই। যারা ভালো কাজ করে, তাদের তো শাসকদের ভয় পাবার কোনো কারণই থাকে না। ভয় পাবার কারণ থাকে বরং তাদেরই, যারা মন্দ কাজ করে। কর্তৃপক্ষের কাউকে তুমি ভয় পাবে না, তুমি কি তেমনটি চাও? বেশ তো, যা ভালো, তাই কর। তাহলে তুমি তো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসাই পাবে। আসলে তাঁরা তো ঈশ্বরেরই নিয়োজিত সেবাকর্মী– তোমার মঙ্গল করার জন্যেই নিয়োজিত তাঁরা। কিন্তু তুমি যদি মন্দ কাজ কর, তাহলে তোমার ভয় পাবার কারণ অবশ্যই আছে। তাঁরা তো শুধু শুধু তলোয়ার সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়ান না; তাঁরা তো ঈশ্বরের সেবক: যারা মন্দ কাজ করে, তাদের ওপর ঐশ ক্রোধের আঘাত হানার দায়িত্ব তাঁদেরই হাতে রয়েছে। সুতরাং তাঁদের প্রতি তোমাদের অনুগত হয়ে থাকতেই হবে–শুধুমাত্র ঐশ ক্রোধের আঘাতকে ভয় পাও বলেই নয়, বিবেককে মান্য কর বলেই" (রোমীয় ১৩:১–৫)।

এর মধ্য দিয়ে সাধু পল আমাদের কাছে বলতে চান যে আমরা যেন শাসনকর্তাদের ভালোবাসার মাধ্যমে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি। কারণ শাসকগণ ঈশ্বরেরই সেবক। কাজেই ভালোবাসা আছে বলে আমরা কোনো ভয় যেন না পাই। যারা মন্দ কাজ করে তাদের মধ্যে দেশের প্রতি ভালোবাসার অভাব আছে। তারা শাসকদেরও ভয় পায়।

সামসংগীত লেখক লিখেছেন:

ধন্য সেই জাতি, ঈশ্বর যার আপন প্রভু;
ধন্য সেই জনসমাজ, যাকে নিজেরই জাতি-রূপে তিনি করেছেন মনোনীত!
ঈশ্বর তো স্বর্গ থেকে তাকিয়ে দেখেন;
সব মানুষকে দেখতেই পান তিনি।
সুবিপুল রাজবাহিনী রাজাকে বাঁচাতে পারে না;
যোদ্ধার মহা বাহুশক্তিও সেই যোদ্ধাকে রক্ষা করতে পারে না।
যুদ্ধ-অশ্ব সম্বল করে জয়ের আশা তো বৃথা;
সেই অশ্বের যত তেজ থাক, কাউকে বাঁচাতে পারে না।
ঈশ্বরের দৃষ্টি কিন্তু নিয়ত তাদেরই প্রতি,
তাঁকে সম্ভ্রম করে যারা,
তাঁরই কৃপা-প্রত্যাশী যারা।
তাদের তিনি তো মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করবেন,
প্রাণ বাঁচাবেন দুর্ভিক্ষের দিনে। (সাম ৩৩: ১২–২২)

এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যেক দেশের মানুষ যেন ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে। কারণ ঈশ্বরই তাদের লালনপালন ও রক্ষা করেন। ঈশ্বরের শক্তিতেই তারা বিপদআপদ ও শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা পায়।

সাধু পিতর তাঁর প্রথম ধর্মগ্রন্থে বলেন, "তোমরা কিন্তু এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জাতি, একান্তভাবে পরমেশ্বরেরই আপন জাতি। তোমরা এজন্যেই মনোনীত, যাতে তোমাদের যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোকে আহ্বান করেছেন, তাঁরই সমস্ত মহাকীর্তির কথা তোমরা যেন প্রচার করতে পার। এককালে কোনো জাতিই ছিলে না তোমরা, কিন্তু আজ হয়ে উঠেছ স্বয়ং পরমেশ্বরেরই জাতি; এককালে তাঁর করুণার পাত্রও ছিলে না তোমরা কিন্তু আজ তোমরা, তাঁর করুণা পেয়েই গেছ" (১পিতর ২:৯–১০)।

সাধু পিতর আমাদের বলতে চান যে, আধ্যাত্মিকভাবে আমরা ঈশ্বরের আপন জাতি। যদি আমরা তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা বজায় রাখি, যদি তাঁর সব নিয়মকানুন পালন করে চলি তবেই আমরা তাঁর আপন জাতি।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. তোমরা তোমাদের শত্রুদের ——————।

২. যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের জন্য —————— প্রার্থনা কর।

৩. তোমরা একে অন্যের প্রতি —————— হও।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যারা মন্দ কাজ করে	▪ ক্ষমা করে নাও
২. ক্ষমার সুফল	▪ তবে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই
৩. পরস্পরকে তোমরা	▪ তারা শাসকদেরও ভয় পায়
৪. যদি আমরা ক্ষমা করতে না-চাই	▪ অন্তরে শান্তি বিরাজ করে
৫. সহনশীলতা একটি অর্জনযোগ্য	▪ প্রতীক্ষা করে থাকি
	▪ মানবিক গুণ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'পিতা, ওদের ক্ষমা কর ! ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে না' –উক্তিটি কার ?

ক. পিতরের খ. স্তিফানের
গ. যোহনের ঘ. যীশুর

২. কীভাবে সহনশীল হওয়া যায় ?

ক. ধৈর্য ধরে খ. ক্ষমা করে
গ. বিবেচনা করে ঘ. সেবা করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রফুল্ল বিদেশে থাকেন, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে গ্রামে। সবসময়ই তার চোখে ভেসে ওঠে গ্রামের সবুজ ফসলের মাঠ, নদীর পানি ও পাখির কলরব। আবার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করলেও চমকে ওঠে। তিনি বিদেশে পরিবেশ বিষয়ক ডিগ্রি গ্রহণ করেন। তাই তিনি চিন্তা করেন গ্রামের পরিবেশকে কীভাবে রক্ষা করা যায়। তিনি গ্রামে ফিরে আসলেন এবং এ বিষয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করলেন। গ্রামের লোকেরা এ কাজে অনুপ্রাণিত হলো।

৩. প্রফুল্লের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে ?

ক. সহযোগিতা খ. দেশপ্রেম
গ. সহনশীলতা ঘ. আত্মসংযম

৪. প্রফুল্ল এ কাজের ফলে পেতে পারে না –

i. প্রশংসা
ii. শান্তি
iii. ঐশশক্তি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিলয়, অয়ন ও ঐশী সহপাঠী। একইসঙ্গে স্কুলে যায় ও খেলাধুলা করে। তিনজনই খুব বিশ্বাসী বন্ধু। একদিন ঐশীর কাছ থেকে অয়ন একটা বই ধার নিল। পরীক্ষার ঠিক আগের দিন ঐশী তার বইটা ফেরত চাইল। কিন্তু অয়ন বলল, 'কোনো প্রমাণ নেই যে আমি তোমার বই নিয়েছি।' ঐশী তার কথায় খুব আঘাত পেল। তার এই অস্বীকারের কথা ঐশী নিলয়কে জানাল। নিলয় রেগে গিয়ে অয়নকে মার দিল। অয়ন নিজের ভুল বুঝতে পেরে বইটা নিয়ে এলো। ঐশীর সব কষ্ট ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু নিলয় কিছুতেই অয়নকে সহ্য করতে পারল না।

ক. সহনশীলতা আমাদের কাজে কী আনে ?

খ. ঈশ্বর কেন আমাদের পাপ ক্ষমা করেছেন ?

গ. ঐশীর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নিলয়ের এ কাজের পরিণতি বিশ্লেষণ কর।

২. সুজন ও মৈত্রী এক বাসে করে স্কুলে যাচ্ছিল। ড্রাইভার নিয়মমাফিক গাড়ি চালাচ্ছিল। স্কুলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে এইজন্য খুব চিন্তা করছিল সুজন। সে বার বার ঘড়ি দেখছিল এবং বিরক্ত হচ্ছিল ড্রাইভারের ওপর। চলন্ত গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। বাইরে কী হচ্ছে সেটা না বুঝে সুজন ও গাড়ির অন্যান্য লোকেরা খুব বকা দিচ্ছিল ড্রাইভারকে। সবাই মিলে খুব খারাপ কথা বলতে লাগল। পরিস্থিতি খারাপ বুঝে মৈত্রী বলে উঠল, 'সুজন কেন বকা দিচ্ছ ড্রাইভারকে। ওনারতো কোনো দোষ নেই। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যইতো তিনি বাস থামিয়েছেন। ধৈর্য ধরেন আপনারা, রাগ করবেন না। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলকে নিয়ে যাবেন নিরাপদে।'

ক. দেশপ্রেম কী ?

খ. আমরা কেন শাসকদের অনুগত থাকব ?

গ. মৈত্রীর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মৈত্রীর মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের চর্চার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায় ?

২. নিজেকে প্রকাশ করার জন্য আমাদের মাঝে কী থাকতে হবে ?

৩. সহনশীলতা বলতে কী বোঝায় ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ক্ষমা করার ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

২. সহনশীলতা অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

৩. দেশপ্রেম সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা কী ? বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং

ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং, সিএসসি পবিত্র ক্রুশ সংঘের একজন যাজক ছিলেন। যীশুর নামে জীবন উৎসর্গ করে মা বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, আপন দেশ–সবকিছু ত্যাগ করে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গে) আগমন করেন। যাজকীয় সেবাকাজের পাশাপাশি তিনি সমাজকর্মের মধ্য দিয়ে মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে আপন করে পেয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক এবং কারিতাস, প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এদেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে তিনি এদেশের মাটিতেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এদেশের মাটির কোলেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন। আমরা এখানে ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানব এবং তাঁর জীবন ও কাজের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাব। এর পাশাপাশি আমরা দরিদ্র ও অভাবী মানুষের সেবাকাজে উদ্বুদ্ধ হবো।

ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- ফাদার ইয়াং-এর শৈশব ও শিক্ষাজীবন বর্ণনা করতে পারব।
- ঋণদান সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় ফাদার ইয়াং-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দারিদ্র্য বিমোচনে ফাদার ইয়াং-এর অবদান বর্ণনা করতে পারব।
- সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের প্রতি মমত্ববোধ দেখাব।

পাঠ ১: শৈশব ও শিক্ষাজীবন

ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ডানিয়েল ইয়াং ও মায়ের নাম মেরি জেনিংস। তাঁদের উভয়েরই পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল আয়ারল্যান্ডে। বহু আগে তাঁরা অধিকতর সুখের সন্ধানে আয়ারল্যান্ড ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। চার্লসদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে। আর মেরি জেনিংসদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন এরও কিছুকাল পরে। 'ইয়াং' শব্দের অর্থ হচ্ছে তরুণ। কাজেই ইয়াংদের পরিবারের আদর্শবাণী হচ্ছে 'সদা তরুণ' থাকা অর্থাৎ সব সময় তরুণ থাকা। ফাদার ইয়াং তাঁর সারা জীবনের কথায় ও কাজে তরুণ ছিলেন।

ফাদার ইয়াং-এর বাবা ডানিয়েল ছিলেন নিউইয়র্কের অবার্ন শহরে একটি কারখানার কর্মী। এই কারখানায় কাজ পাবার পর তিনি মেরি জেনিংস-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। দুইজনে মিলে একটি সুখী-সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁরা দুইজনে মিলে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। তাঁদের ঘরে তিনটি সন্তান জন্ম নেয়। চার্লস ছিলেন তাঁদের মধ্যে তৃতীয়। চার্লসের মা মেরি তাঁর চতুর্থ সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় মৃত্যুবরণ করেন, সন্তানটিও মারা যায়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে চার্লসের বাবা অসহায় হয়ে পড়েন। কারখানায় কাজ করা ও সন্তানদের লালনপালন– দুই কাজ একসাথে চালিয়ে যাওয়া ডানিয়েলের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেকটা নিরুপায় হয়ে চালর্সের বাবা সন্তানদেরকে একটি অনাথ আশ্রমে রাখেন। কিছুদিন পর তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এবং সন্তানদের তার কাছে নিয়ে আসেন।

চার্লসের বড় ভাই ফ্র্যাঙ্ক সেন্ট বার্নার্ড সেমিনারিতে কাজ করতেন। দুই বছর কাজ করার পর পড়াশুনার উদ্দেশ্যে তিনি অন্যত্র চলে যান। ভাইয়ের ছেড়ে দেওয়া সেমিনারির কাজটি চার্লস সাদরে গ্রহণ করলেন। এখানে তাঁর কাজ ছিল ফুট-ফরমায়েস, দারোয়ানগিরি এবং অন্যান্য ছোটখাট কাজকর্ম করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময়ও তিনি ওখানে ছিলেন।

প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে চার্লস হাই স্কুলের পড়া শুরু করেন। তিনি নিউইয়র্কের সিরাকিউজে অবস্থিত দ্য মোস্ট হলি রোজারি হাই স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলটি পরিচালনা করতেন ইম্মাকুলেট হার্ট অব মেরি সংঘের সিস্টারগণ। এই ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার মেহন ছিলেন খুবই দয়ালু। তিনি চার্লসকে পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগ দিয়ে পূর্ববঙ্গে মিশনারি কাজে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

পাঠ ২: যাজকীয় জীবনের গঠন ও যাজকাভিষেক

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, ২১ বছর বয়সে চার্লস পবিত্র ক্রুশ সেমিনারিতে প্রবেশ করেন। তখন এই সেমিনারিটিকে ক্ষুদ্র সেমিনারি বলা হতো। এটি আমেরিকার ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। চালর্সের সব ক্লাস এই নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়েই অনুষ্ঠিত হতো। ফাদার ইয়াং আর্মি চ্যাপলেইন-এর কাজ করেছিলেন। এই কর্মদায়িত্ব নিঃসন্দেহে তাঁকে প্রাণবন্ত সশস্ত্রবাহিনীর ন্যায় শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গঠনে প্রভাবিত করেছিল। নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে তিনি একই ক্যাম্পাসে অবস্থিত সেন্ট যোসেফ নভিশিয়েটে প্রবেশ করেন। প্রার্থনাশীল ও ঈশ্বরভক্ত চালর্স তাঁর নভিশিয়েট শেষ করে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর ব্রতসংখ্যা ছিল চারটি: দরিদ্রতা, কৌমার্য, বাধ্যতা এবং বিদেশে বাণী প্রচার।

চার্লস তাঁর শিক্ষা ও যাজকীয় জীবনের গঠনকালে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তাঁর পরিচালকদের বেশিরভাগই ছিলেন নামকরা ব্যক্তি এবং বিভিন্ন বিশেষ গুণে গুণান্বিত। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফাদার টমাস ইরভিং। তিনি ছিলেন একজন অঙ্কবিশারদ ও অত্যন্ত ধৈর্যশীল মানুষ।

সেমিনারির বিগত দিনগুলো চার্লসের জন্য কঠিন ছিল বটে কিন্তু সেগুলো খুব আনন্দের মধ্য দিয়েই কেটেছে। ফাদার চার্লস যে. ইয়াং খেলাধুলা খুবই ভালোবাসতেন। শারীরিক উচ্চতা কিছুটা কম থাকায় তিনি ফুটবল ও বাস্কেটবল খেলতেন না। হাই স্কুলের শুরু থেকে একেবারে যাজকীয় অভিষেকের পূর্ব পর্যন্ত তিনি খেলেছেন টেনিস। খেলাধুলায় তিনি ছিলেন যেমন সক্রিয় তেমনি কাজেকর্মেও ছিলেন সমপরিমাণ সক্রিয়। একারণেই দেহে তিনি অফুরান শক্তি পেতেন এবং তাঁর দৈহিক গঠনও যথেষ্ট সুঠাম ছিল। যারা তাঁকে আগে কখনো দেখেনি তারা সবসময় তাঁকে তাঁর সঠিক বয়সের চাইতে অনেক কমবয়সী মনে করত। এভাবে যখনই কেউ তাঁকে বলত, তাঁর বয়স সঠিক বয়সের চাইতে কম মনে হয় তখন তিনি বলতেন: "আমি তো সবসময়ই ইয়াং"।

চার্লস মিশনারি হয়ে বিদেশে যাবেন, এই চিন্তা সেমিনারি জীবনের প্রস্তুতিকালে সর্বদা তাঁর মন জুড়ে থাকত। তাই তিনি অনবরত চেষ্টা করতেন নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন ও নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করার। এভাবে তিনি সবজান্তা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বাগানে শাকসব্জি লাগানো থেকে শুরু করে রান্নাবান্না, পাইপলাইন মেরামত থেকে শুরু করে দালানে ইট বসানো, মিস্ত্রিকাজ থেকে শুরু করে প্রাথমিক চিকিৎসা পর্যন্ত সবকিছুই একটু একটু করে জানার চেষ্টা করেছেন। সেমিনার জীবনেও তিনি সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং মাঝে মধ্যে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত সেমিনারি অতিথি বক্তার-বক্তব্য শুনতে পেলে ভীষণ আনন্দ উপভোগ করতেন। যেসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ভবিষ্যৎ পুরোহিত হিসেবে উপকারে আসবে এমনসব প্রোগ্রামে তিনি অংশগ্রহণ করতেন।

চার্লস ইয়াং-কে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াশিংটন ডি.সিতে অবস্থিত ফরেন মিশন সেমিনারিতে পাঠানো হয়। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন একটি অসম্ভব স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল। নটর ডেম বিশ্ববিদ্যাদলয় ক্যাম্পাসে সেদিন চার্লস ইয়াং তাঁর সতীর্থদের সাথে মিলে যাজকপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এরপর তিনি সিরাকিউজে ফিরে গিয়েছিলেন; সেখানে তিনি তাঁর ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ধন্যবাদের খ্রিষ্টযাগটি উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে যাজক হয়ে ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং, সিএসসি ঐ বছরেরই অক্টোবর মাসে মিশনারি কাজের জন্য পূর্ববঙ্গের উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। পূর্ববঙ্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার পূর্বে ফাদার ইয়াং তিন মাস সময় পেয়েছিলেন। ঐ সময়টুক তিনি ব্যয় করেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত মিশনারিদের জন্য আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করে। অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখে তাঁরা কয়েকজন মিলে পূর্ববঙ্গের জন্য স্বদেশভূমি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের দলে নটর ডেম কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ফাদার জন হ্যারিংটনও ছিলেন। তাঁদের দলটি নিউইয়র্ক থেকে সামুদ্রিক জাহাজে করে রওনা দেন। ইতালির নেপল্‌স ও রোম এবং পরে বম্বে ও কলকাতা হয়ে ঢাকায় পৌঁছেন ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর।

পাঠ ৩: সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠায় ফাদার ইয়াং

ফাদার ইয়াং পৃথিবীর ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) মতো একটি দরিদ্র দেশে কাজ করতে এসেছেন। তিনি ময়মনসিংহ এলাকায় দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। মানুষকে দরিদ্রতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি বহু চিন্তাভাবনা করেছেন ও নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেছেন। অবশেষে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, সমবায় ঋণদান সমিতির দ্বারাই এই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব। তিনি মানুষকে নগদ টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। এধরনের কাজ তিনি পছন্দও করতেন না। এর চাইতে বরং মানুষকে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সহায়তা করাকেই সবচেয়ে উপকারি সাহায্য বলে গণ্য করতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল: প্রত্যয়, স্থির লক্ষ্য, কঠোর শ্রম-সাধনা এবং বলিষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি থাকলে যে-কোনো মানুষের পক্ষে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। তাই তিনি এবিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করার চিন্তাভাবনা করছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে কো-অপারেটিভ কাজে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। এই বিষয়ে নিজের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নেওয়ার পর তিনি আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার সিএসসি-র কাছে গেলেন। তাঁকে তিনি বোঝালেন যে, এতদিন তাঁরা ধর্মপল্লীতে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে জনগণকে সংগঠিত করার কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন তাঁরা বুঝতে পারছেন, দলীয়ভাবে জনগণের মধ্যে গতিশীলতা আনতে হবে, তাদেরকে সংঘবন্ধ করতে হবে। এভাবে বর্তমান সমাজের গুরুতর সমস্যাবলির আবর্ত থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এজন্য দরকার বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা।

এই লক্ষ্যে ফাদার ইয়াং-এর বিপুল উৎসাহ দেখে আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার ফাদার ইয়াংকে কানাডায় অবস্থিত নোভা স্কটিয়া-র এ্যান্টিগোনিশ-এ সমবায় ঋণদান সমিতির ওপর পড়াশুনা করার জন্য পাঠালেন। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪– এই দুই বছর পড়াশুনা শেষ করে তিনি দেশে ফিরলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন।

সমবায় ঋণদান সমিতি

সমবায় ঋণদান সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে স্পষ্ট একটি ধারণা থাকা দরকার। ক্রেডিট ইউনিয়নকে বলা যেতে পারে সহৃদয়তা বা পরদুঃখকাতরতার সাথে টাকা জমা করা ও নিম্নতম পরিমাণ সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করার একটা প্রক্রিয়া। আবার এটাকে বিবেকহীন সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়ও বলা যেতে পারে। কেউ কেউ আবার এটাকে বলতে পারে একটি অধিকতর ভালো ও পরিপক্বতর সমাজজীবনের ভিত্তি। ফাদার ইয়াং-এর মতে, ক্রেডিট ইউনিয়ন হচ্ছে আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভক্তদের মনোভাব অনুসারে অধিকতর কল্যাণকর ও অধিকতর সম্পদশালী সমাজজীবন গঠনের ভিত্তিস্বরূপ । তিনি বলতেন, সমাজ গঠন করার অর্থ স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তোলা। এটি স্থানীয় মণ্ডলীকে বিদেশি সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করবে ও ধর্মপল্লীগুলোকে পরিচালনার ব্যয়ভার বহনে আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে।

প্রথম খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্ম

কানাডায় প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ফিরে এসে ফাদার ইয়াং আর্চবিশপ হাউসে থাকতে শুরু করেন। এখান থেকে তিনি এক মিশন থেকে অন্য মিশনে যাতায়াত করে ভক্ত জনগণ ও যাজকদের প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। এর মধ্যে দেশে আবার নানারকম দাঙ্গা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা, বন্যা, খরা, ঝড়বাদল ইত্যাদি

একটার পর একটা লেগেই রইলো। এত কিছুর পরেও ফাদার ইয়াং নিরুৎসাহিত হননি। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলল। নেতৃবৃন্দের সাথে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সকলেরই টাকার প্রয়োজন এবং পরের কাছে হাত না-বাড়িয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। পরে পুরান ঢাকার লক্ষীবাজারে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হলো প্রথম ক্রেডিট ইউনিয়ন। বার্নার্ড ম্যাককার্থি ছিলেন এর প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন যোনাস রোজারিও। সমবায় ঋণদান সমিতির নাম দেওয়া হয় খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড। মন্ত্রবাণী হিসেবে তাঁরা গ্রহণ করলেন ফাদার ইয়াং-এর একটি কথা: "দয়ার কাজের জন্য নয়, লাভের জন্যও নয়, বরং সেবার জন্য।"

ফাদার ইয়াং ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন

ক্রেডিট ইউনিয়নকে তাঁরা রেজিস্ট্রিকৃত করেন। রেজিস্ট্রি নম্বর ছিল ৪২। শুরুতে সদস্যসংখ্যা ছিল ৬০ জন এবং বছরের শেষাশেষি গিয়ে এর সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১১০। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছিল:

ক) সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়িতার মনোভাব জন্মানো;

খ) সদস্যদের মধ্যে উৎপাদনশীল ও দূরদর্শী (প্রভিডেন্ট) উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়ার জন্য তহবিল গঠন;

গ) সদস্যদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল ও পারস্পরিক উপকার সাধনের মনোভাব বপন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

প্রথম ক্রেডিট ইউনিয়নটি খুব ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এর সদস্যসংখ্যা ছিল ২৩৭ জন। ইউনিয়নের দশম বার্ষিকীতে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৭৬ জনে। শহরের বেশিরভাগ জনগণেরই মূল বাসস্থান কোনো না কোনো গ্রামে। ছুটিতে তারা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন ও এর কৃতকার্যতার কথা বর্ণনা করতেন। এর ফলে প্রতিটি মিশনেই ক্রেডিট ইউনিয়ন দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

নিধন ডি' রোজারিও *সমবায় খবর*–এর তৃতীয় সংখ্যায় লিখেছিলেন যে, কেরানি, গৃহিণী, বাবুর্চি, নার্স ও শিক্ষার্থী ক্রেডিট ইউনিয়ন কো–অপারেটিভে যোগ দিয়ে অনেকভাবে উপকৃত হচ্ছে। তারা এর যথাযথ পরিচালনার ওপর বিশ্বাস ও আস্থার শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়েছে।

ফাদার ইয়াং-এর দূরদর্শী চিন্তার আরেকটি যুগান্তকারী ফসল হলো 'দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ।' এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় কাল্ব। এটি ক্রেডিট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংগঠন এবং এর গঠনকাল হলো ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি। বর্তমানে এর কর্মপরিধি সারা বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের মাঝে।

পাঠ ৪: দারিদ্র দূরীকরণে ফাদার ইয়াং-এর ভূমিকা

ফাদার ইয়াং এদেশের মাটি ও মানুষকে ভীষণ ভালোবেসে ফেললেন। এদেশের দরিদ্র মানুষের কান্না ফাদার ইয়াং–এর হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। কারণ দরিদ্র ও কষ্টভোগী মানুষের মাঝেই তিনি খ্রিস্টকে দেখতেন। মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই খ্রিস্টকে সেবা করার ব্রত নিয়েছিলেন তিনি। তাই মানুষকে কীভাবে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যায় তা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলেন। তবে তিনি খুবই নীতিবান মানুষ ছিলেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, ভিক্ষা দিয়ে মানুষের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। মানুষকে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্য করার মধ্য দিয়েই তাদের প্রকৃত সাহায্য করা হয়। তাই তিনি এদেশের মানুষের দারিদ্রতা দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

(ক) ধর্মপল্লী পর্যায়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রচেস্টা: ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং বর্তমান ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বাঐবাদা (মরিয়মনগর), বিড়ইডাকুনী, বারমারী, রাণীখং ইত্যাদি অঞ্চলে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি সেখানে মানুষকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ঐসব অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের জন্য ধানব্যাংক পরিচালনা করেছেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ঐসব অঞ্চলের অসহায় মানুষদের ওপর হয়রানি, নির্যাতন ও লুটপাট চালানো হয়েছিল। তিনি সেগুলোর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অসীম সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি দরিদ্র মানুষকে নিজ নিজ বাসস্থানে শান্তিতে বসবাস করতে সহযোগিতা করেছেন। তিনি তাদের অভাব মোকাবেলা করার জন্য কৃষিজীবী মানুষকে ফসলের বীজ, গৃহপালিত পশু ও আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। এভাবে তিনি অভাবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

(খ) কারিতাস প্রতিষ্ঠা: বর্তমান কারিতাস বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে ফাদার ইয়াং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কারিতাস শুরু করেছিলেন। এই কারিতাস ছিল রোমের আন্তর্জাতিক কারিতাসের অধীনে। ফাদার ইয়াং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে কারিতাসের যাত্রা বিস্তৃত করছিলেন। এ-সময়ের কারিতাস ধর্মপল্লী পর্যায়ে সীমিত আকারে মাত্র গুটিকয়েক প্রকল্প পরিচালনা করত। রোম থেকে কিছু আর্থিক মঞ্জুরি দেওয়া হতো। রোমের আর্থিক সাহায্যের আশায় না থেকে ধর্মপল্লীর স্থানীয় জনগণকেও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানে অনুপ্রাণিত করা হতো। এই তহবিলের অর্থ প্রধানত ব্যবহার করা হতো কষ্টকর বা দুর্যোগমূলক পরিস্থিতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

(গ) কোর প্রতিষ্ঠায় ফাদার ইয়াং-এর অবদান: ১৯৭০ খ্রিস্টব্দের ১০ নভেম্বর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘটেছিল এক প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাস। এর ফলে অগণিত মানুষ মারা গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ স্বজনহারা, গৃহহারা ও ফসলহারা হয়েছিল। বহু বছর পর এই সময় ফাদার ইয়াং ছুটি কাটাতে নিজ দেশে গিয়েছিলেন।

এক মাস ছুটি কাটাতে না কাটাতেই বিশপ গাঙ্গুলি তাঁকে এক জরুরি তারবার্তা পাঠিয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ দিলেন ও অতি সত্বর ফিরে এসে ত্রাণকার্যে যোগ দিতে বললেন। তিনি অনতিবিলম্বে ফিরে আসেন। এসেই অসহায় মানুষের সাহায্যে নিবেদিত হয়ে পড়েন। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি ও ফাদার বেঞ্জামিন লাবে, সিএসসি-র সাথে একাত্ম হয়ে তিনি 'কোর' নামক ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থা স্থাপন করেন ও ত্রাণকাজ শুরু করেন। এই ক্ষতির রেশ শেষ না-হতেই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লাখ লাখ মানুষের কল্যাণে ও পুর্ণগঠন কাজে ফাদার ইয়াং কোরের পরিচালক ও অন্যান্য কর্মীদের সাথে এক হয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। এই কোর পরে কারিতাস বাংলাদেশ নাম নিয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে দীনদরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

(ঘ) এনএফপি প্রতিষ্ঠায় ফাদার ইয়ং: কর্মপাগল বিচক্ষণ পরিকল্পনাকারী ফাদার ইয়াং বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নিবেদিত হয়ে কাজ করেছেন। তিনি প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে জনসংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। পুরো কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে ফাদার ইয়াংকে সহযোগিতা করেছেন সিস্টার ইমেল্ডা এসএমআরএ। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এনএফপির যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে কারিতাস এটি বাংলাদেশ-এর একটি প্রকল্প। কমিউনিটি হেলথ এ্যান্ড ন্যাচারাল 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং' দেশের মানুষের উপকারে কাজ করছে। পরিকল্পিত পরিবার গঠন করে মানুষ তার দরিদ্রতা দূর করবে–স্বর্গীয় ফাদার ইয়াং এই স্বপ্নই দেখেছিলেন।

পাঠ ৫: ফাদার চার্লস ইয়াং আজও জীবন্ত

ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং ইহলোক ত্যাগ করেছেন ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর। ইতোমধ্যে তাঁকে ভুলে যাওয়ার মতো অনেক বছর পার হয়েছে। কিন্তু তাঁকে মানুষ মোটেও ভুলে যায়নি। বরং তাঁকে দিনে দিনে মানুষ যেন আরও বেশি করে স্মরণ করছে। তাঁর নামে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্ম নিচ্ছে। কারিতাস, ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন, প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা– এসব শুধু টিকেই থাকছে না, অগণিত মানুষের জীবনে এগুলো ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলছে। ফাদারের নামের অর্থটি যেমন চিরতরুণ (ইয়াং), তেমনি তাঁর জীবনের কর্মগুলোও চিরতরুণ রয়ে গেছে। এই কর্ম দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে এবং পৌঁছে যাচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

ফাদার ইয়াং ফাউন্ডেশন

ফাদার ইয়াং ফাউন্ডশন হলো তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানার্থে প্রতিষ্ঠিত সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে এটি 'ফাদার ইয়াং মেমোরিয়াল ফান্ড' নামে শুরু হয় এবং ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে এটির নাম পরিবর্তন করে 'ফাদার ইয়াং ফাউন্ডেশন' রাখা হয়। এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) ক্রেডিট ইউনিয়নের ধারণাটি সমাজের দরিদ্রতম ও অবহেলিত বিভিন্ন দলের কাছে বিস্তার করার যথাযথ সহায়তা পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করা;

খ) ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা;

গ) ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠতে সহায়তা করা; এবং

ঘ) শ্রেষ্ঠ ক্রেডিট ইউনিয়ন, শ্রেষ্ঠ কো–অপারেটর ও শ্রেষ্ঠ কর্মীদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা ও প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করা।

আরও পদক্ষেপ নেওয়া হয় যে,

ঙ) বাংলাদেশের সকল ক্রেডিট ইউনিয়ন ফাদার ইয়াংকে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রবর্তক বলে ঘোষণা করবে।

চ) তেজগাঁ কবরস্থানে ফাদার ইয়াং-এর কবরটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সংরক্ষণ করা হবে।

ছ) দেশে ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোকে তাদের কার্যালয় বা হলঘরের নাম ফাদার ইয়াং-এর নামানুসারে রাখার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রথম প্রেসিডেন্ট বার্নার্ড এল. ম্যাককার্থী লিখেছিলেন:

যে পনের জন 'কুলিকে' ক্রেডিট ইউনিয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যে মাটি কাটার জন্য ডেকে একত্রিত করা হয়েছিল, আমাকে তাদের সর্দারের ভূমিকা পালন করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল বলে আজ খুবই তৃপ্তি অনুভব করছি। সেই বিস্ময়কর মানুষটি অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস ইয়াং, সিএসসি আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রের মাটিতে যে ধারণার বীজ বপন করেছিলেন সেটার থেকে একটা ইউনিয়ন গড়ে তোলা আমাদের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জপূর্ণ ছিল। ভিত্তিপ্রস্তরের জন্য গর্ত খনন করাও সহজ কাজ ছিল না। তথাপি আমাদের জনগণের মধ্যে গভীর বিশ্বাস ও সেবার পর সেবা, এরপর আরও সেবা–এভাবে আমরা সুবৃহৎ অট্টালিকাটির মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য মজবুত চরণগুলো দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা, প্রবর্তকরা, আজ আপনাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি কারণ আপনারা ক্রেডিট ইউনিয়নকে জীবিত রাখার ও ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠার কাজটি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ইয়াংদের পরিবারের আদর্শবাণী হচ্ছে ————————।

২. ইয়াং ———————————— খুব ভালোবাসতেন।

৩. ———————— গঠন করার অর্থ স্থানীয় মণ্ডলী গঠন কর।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষে	▪ খেলাধুলা খুব ভালোবাসতেন
২. ফাদার চার্লস ইয়াং	▪ তিনি খ্রিস্টকে দেখতেন
৩. সমাজ গঠন করার অর্থ	▪ সেন্ট যোসেফ লভিশিয়েট প্রবেশ করেন
৪. দরিদ্র ও কষ্টভোগী মানুষের মাঝেই	▪ তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল
৫. পরিকল্পিত পরিবার গঠনে	▪ স্থানীয় মণ্ডলী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফাদার ইয়াং তাঁর সারা জীবনে কাজে কেমন ছিলেন ?

ক. বিনয়ী

খ. উৎসাহী

গ. তরুণ

ঘ. অনুপ্রাণিত

২. ফাদার ইয়াং-এর মতে সমাজ গঠন করার অর্থ ?

ক. স্থানীয় সমাজ গড়ে তোলা

খ. স্থানীয় সম্প্রদায় গড়ে তোলা

গ. স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তোলা

ঘ. স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রজত গণিতে দুর্বল। তার শ্রেণিতে অন্যের খাতা দেখে লেখার অভ্যাস। তার বন্ধু সমির এই অবস্থা দেখে রজতকে একদিন ডেকে গণিতের নিয়ম বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। এরপর থেকে রজতকে যে কোনো অঙ্ক দেওয়া হয়, তাই তার কাছে সহজ মনে হয়। গণিতের প্রতি ভীতি দূর হয়।

৩. সমিরের কাজে ইয়াং-এর যে গুণটি প্রকাশ পায় তা হলো –

i. অজ্ঞতা দূর করা

ii. সহযোগিতা করা

iii. প্রকৃতই সাহায্য করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪. সমিরের উক্ত কাজে রজত হয়ে উঠতে পারে –

ক. আত্মনির্ভরশীল খ. সাহসী

গ. সংযমী ঘ. বুদ্ধিদীপ্ত

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কলিন্স পরিবারের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন। গত বছর টর্নেডোর পর কলিন্স কাপড়, খাবার, পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে দুর্গম এলাকায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। তাঁর উপস্থিতি অসহায় মানুষগুলোকে বেঁচে থাকার আশা যোগায়। কলিন্স ঐ গ্রামের শিক্ষার উন্নয়নেও এগিয়ে আসেন। তিনি ভেঙে যাওয়া স্কুল-কলেজগুলো মেরামতের ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেন।

ক. চার্লসের বড় ভাই কোথায় কাজ করতেন ?

খ. ফাদার ইয়াং সারা জীবনই তরুণ–এ বাক্যটির মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. ফাদার ইয়াং-এর কোন সংস্থার কার্যক্রমের দ্বারা কলিন্স অনুপ্রাণিত হয়েছিল– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফাদার ইয়াং ও কলিন্সের কার্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. পাহাড়তলিতে অনিমা খুব ধর্মভীরু ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন নারী, যিনি মানুষকে মিতব্যয়ী হতে ও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেন। তিনি ঐ এলাকার বিভিন্ন মানুষের আয়ের অতিরিক্ত টাকা তাঁর কাছে জমা রেখে একটি সমিতি গঠন করেন, যেখান থেকে তাদের সদস্যদের প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করেন। ফলে অনেক লোক তাদের প্রয়োজনের সময় আর্থিক সাহায্য পেয়ে লাভবান হয়।

ক. কাল্ব কোন সংস্থার সংক্ষিপ্ত রূপ?

খ. কারিতাস বাংলাদেশের জন্য কী ধরনের কাজ করে ?

গ. ফাদার ইয়াং-এর কোন কাজের শিক্ষা অনিমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল ?

ঘ. 'অনিমার কাজ ঐ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে'– তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইয়াং শব্দের অর্থ কী ?

২. চার্লস শিশুকালে কোথায় ছিলেন ?

৩. চার্লস তার নভিশিয়েট কবে শেষ করেন?

৪. তিনি কয়টি ব্রত নিয়েছিলেন? সেগুলো কী কী ?

৫. কোথায় চার্লস ইয়াং যাজক পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় ফাদার ইয়াং-এর অবদান আলোচনা কর।

২. কোন বিষয়টি সামনে রেখে ফাদার ইয়াং খ্রিষ্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপন করেন ?

৩. ফাদার ইয়াং দারিদ্র্য দূরীকরণে কেমন ভূমিকা পালন করেছেন ?

সমাপ্ত

২০২০

শিক্ষাবর্ষ

৭ম-খ্রিষ্টধর্ম

বাকসংযমী মানুষই যথার্থ মানুষ

– বাইবেল

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য